অনীক

ডিসেম্বর ২০১৪
বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ৬
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

মোবাইল টাওয়ার : এক চলমান বিপদ □ অচ্যুত সেনগুপ্ত □ ২

মোবাইল টাওয়ার বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা □ সুব্রত রায়চৌধুরী □ ৫

আরব বসন্তের অবসান ও আক্রান্ত মানব অধিকার □ তড়িৎ চৌধুরী □ ৯

প্রবন্ধ

যুদ্ধ, শান্তি থেকে রেহাই ও স্বাধীনতার খোঁজ □ গৌতম নভলখা □ ১১

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও পুঁজিবাদ— ইবোলা : একটি কেস স্টাডি □ সমু □ ২১

মতামত

আফস্পা যদি 'বিবেকী' হয়ে ওঠে □ গৌতম □ ৩০

গ্রন্থসমালোচনা

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা : একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া □ সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত □ ৩৩

দৃষ্টিকোণ

কোরপান হত্যা : মূল্যবোধের চেনা ছক ভেঙ্গে কিছু অচেনা প্রশ্ন □ রাতুল □ ৩৫

স্মরণ

আমাদের কমিউন আর হলো না মীনাক্ষী... □ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৭

এক বিবেকী বিচারকের প্রয়াণ □ সিদ্ধার্থ গুহরায় □ ৪০

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর

''আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে''— এরিক গার্নারের আর্তনাদ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে-বাতাসে ভাসছে। আমেরিকায় নিরস্ত্র, নির্দোষ কালো মানুষরা মার্কিনী পুলিশের হাতে একের পর এক খুন হচ্ছে আর মার্কিনী আদালত অভিযুক্ত পুলিশকে বেকসুর খালাস দিয়ে চলেছে। ২০১২ সালে, ১৭ বছরের নিরস্ত্র আফ্রো-আমেরিকান যুবক ট্রেভন মার্টিনকে গুলি করে হত্যা করেও মার্কিনী শ্বেতচর্ম পুলিশ জর্জ জিমারম্যান মার্কিনী আদালতে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়। ২০১৪ সালে এরিক গার্নার, ১৭ বছরের কিশোর মাইকেল ব্রাউন, ১২ বছরের বালক তামির রাইস, রুমেন ব্রিসবন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়— বিনা দোষে এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এবং এরা প্রত্যেকেই আফ্রো-আমেরিকা সম্প্রদায়ের মানুষ। ইতিমধ্যেই গার্নার ও ব্রাউন হত্যায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের আদালত নির্দোষ আখ্যা দিয়ে মুক্তি দিয়েছে। আমেরিকার কালো সমাজ বিলক্ষণ বুঝেছে যে আফ্রো-আমেরিকা সম্প্রদায়ের মানুষ প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেও, প্রশাসনের চরিত্র পরিবর্তন হয়না। বর্ণবৈষম্যের মানসিকতা মার্কিন প্রশাসনের গভীরে প্রোথিত এবং সঞ্চারিত। *ওয়াশিংটন পোস্ট* বলছে, ''দক্ষিণ আফ্রিকায় যে হারে কালো মানুষকে জেলে পোরা হয়েছিল, আমেরিকা তার থেকে বেশি অনুপাতে কালো মানুষকে জেলবন্দি করেছে। সত্তরের দশকে, বর্ণবৈষম্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো-সাদার মধ্যে যে সম্পদ-বৈষম্য ছিল, এখন আমেরিকায় কালো-সাদার ধন-বৈষম্য তার থেকে বেশি।'' সাদা মানুষদের তুলনায়, আমেরিকার কালো মানুষরা ২১ গুণ বেশি পুলিশের গুলি খাওয়ার ঝুঁকি বহন করে। প্রতি দশ লক্ষে ৩১.১৭ জন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পুলিশের গুলির শিকার। সেক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ যুবকদের অনুপাত ১.৪৭।

গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা আমেরিকা নিজ দেশের মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে না পারলে কী হবে, গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে দেশে দেশে বোমারু বিমান আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়না। এহেন 'গণতন্ত্রের লীলাক্ষেত্র' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে আর এক 'গণতান্ত্রিক দেশ' ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মাত্র নয় বছর আগে, গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে যাকে মার্কিন প্রশাসন ভিসা মঞ্জুর করতে নারাজ ছিল, সেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মার্কিনী প্রভুদের সম্পর্ক আজ অত্যন্ত মাখোমাখো। আরএসএস-ও আমেরিকা বিরোধিতা ছেড়ে বন্ধুত্বে উৎসাহী।

মোদী যখন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের কর্পোরেট সেক্টরের চোখে বিশ্বায়নের অগ্রদূত, মার্কিনী বাণিজ্য মহলের মোদী-সখ্যতায় উৎসাহ থাকবেই। বিশেষত বিজেপি সরকার যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে উদারনীতির যাত্রাপথের আগলগুলি খুলতে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু মোদী সরকারের নজিরবিহীন ওবামা-বরণের পিছনে সম্ভবত আরও গূঢ় কোনো কারণ বর্তমান। মার্কিন সরকারের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমন-নীতি এবং ইসলামি গোষ্ঠীগুলির মার্কিন বিরোধিতা কি মোদী-ওবামা সমঝোতার সড়ক তৈরি করছে? একদিকে আরএসএস-বজরং দল ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিভাজনে উস্কানি দেবে, অপরদিকে সরকার সন্ত্রাস-দমনের আড়ালে দলিত-আদিবাসী সহ সংখ্যালঘু নিপীড়ন চালিয়ে যাবে, আর সন্ত্রাসের এই অলিগলিতে চালিত হবে বিশ্বায়ন— এমন একটা ছক যেন ক্রমশ রূপ নিচ্ছে।

ঘটনাপ্রবাহ

মোবাইল টাওয়ার— এক চলমান বিপদ

মোবাইল ফোন আজকের জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার এক প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে আমাদের মোবাইল ফোনের ওপর নির্ভরশীল করার কারণেই গ্রাহকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে সার্ভিস প্রোভাইডাররা যথেচ্ছভাবে স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অফিসবাড়ির ছাদ, সংকীর্ণ গলি, অপ্রশস্ত রাস্তার দুপাশের আবাসন— সবটাই টাওয়ার বসানোর উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। *ট্রাই*-এর তথ্যানুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কলকাতা টেলিফোন সার্কেলে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষের বেশি। এর মধ্যে অনেক গ্রাহকের একটির বেশি সংযোগ রয়েছে। মোবাইল গ্রাহকের জনপ্রিয়তার উপর ভর করেই বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিযোগিতায় বসানো হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির টাওয়ার। আবার যত বেশি পরিষেবা— টেলিকম দপ্তরের তত বেশি রাজস্ব আদায়। গত ৪ আগস্ট লোকসভায় টেলিকম ও আইটি দপ্তরের মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ লিখিত প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছেন, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি থেকে মোট ১২,৯৫৭.৪২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। যদি সার্বিকভাবে দেখেন তাহলে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, হোর্ডিংয়ের ব্যবসায়ীরা এতে উপকৃত, বিকিরণ-সৃষ্ট অসুখের কারণে ওষুধ কোম্পানিগুলো উপকৃত, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হবার কারণে উপকৃত, যে অঞ্চলে টাওয়ার বসানো হচ্ছে সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদন দেওয়ার অথরিটি হওয়ার কারণে উপকৃত, যার জায়গায় বসানো হচ্ছে সেও পয়সা পেয়ে উপকৃত। অসংগঠিত প্রতিবাদ অঙ্কুরে বিনাশ করার কাজে স্থানীয় বাউন্সাররাও উপকৃত। এই উপকৃতদের মিছিল আর্থিকভাবে দেশের জিডিপি বাড়ানোয় দেশটাও তো উপকৃত! এতগুলো উপকৃতের উপস্থিতির মধ্যে শুধু অনুপস্থিত থাকল মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা।

উন্নয়নের ফানুস উড়িয়ে মোবাইল টাওয়ার নির্মাতারা ফায়দা লুটছেন, আর একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ব্যবহারকারীরা পলিসি মেকারদের চরণে ফুল ছুঁড়ছেন এই আশায়, যেন দুরারোগ্য কোনও রোগের ভোগান্তি না পোহাতে হয়। 'গ্লোবাল ফ্লেভারের' স্বাদ বিতরণের জন্য রয়েছে 'ডব্লিউএইচও'-র দীর্ঘস্থায়ী পর্যবেক্ষণের গল্প। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মানুষের মনের ক্ষতে প্রলেপ দিতে থাকছে টেলিকম দপ্তরের তরফে শক্তপোক্ত নজরদারির ঘোষণা। ফাঁকতালে সার্ভিস প্রোভাইডাররা স্থানীয় স্তরে একের পর এক অন্যায্য অনুমোদন হাতিয়ে নিচ্ছে। অবস্থাটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, স্থানীয় রাস্তার নাম পাল্টে গিয়ে টাওয়ার অ্যাভিনিউ নামে পরিচিতি পেতে যাচ্ছে। প্রশ্নটা হল, আশেপাশের সাধারণ মানুষের শারীরিক ক্ষতির দায় কারা নেবেন? যাঁর নিজস্ব জায়গায় টাওয়ার বসানো হচ্ছে সেই ব্যক্তি? নাকি সার্ভিস প্রোভাইডার অথবা টেলিকম দপ্তর? আমরা মোবাইল পরিষেবার বিরোধী নই—বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির প্রশ্নে রয়েছে বিরোধিতা। সংকীর্ণ ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যথেচ্ছ টাওয়ার বসানো ছাড়া কি কোনও বিকল্প নেই?

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন গত ২৩শে জুন ২০১৪ 'সেলুলার অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর এক আধিকারিক কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের উদ্বেগের কথা যেমন জানিয়েছেন, তেমনি গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে, মোবাইল টাওয়ার বিকিরণ থেকে ক্যানসার হওয়ার কোনো প্রমাণ মেলেনি বলে। এটা ঘটনা। কিন্তু চিহ্নিত যেমন হয়নি, তেমনি উল্টোটাও তো সত্যি, ক্যানসার হবে না সেটাও জোর দিয়ে এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করা যায়নি। ক্যানসারের প্রসঙ্গ তো অনেক পরের ব্যাপার, সেটা তো বেদনা-বিধুর শেষ পর্যায়! তার আগেই শারীরিক অন্যান্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাবধানতা কোথায়? দীর্ঘদিন বাদে ধূমপান নিয়ে সতর্কবাণীর গল্পটা তো অজানা নয়। এটাও বেশ কৌতুকের—মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেল, আর সিগারেট মানবদেহে কোনও ক্ষতি করে কিনা সেটা বুঝতে পারল না। মূল বিষয়টা তো বাণিজ্যের। ওনাদের উদ্বেগের কারণ হলো, স্থানীয় মানুষের বিরোধিতায় গত ২ বছরে দিল্লীতে ১১০টা, মুম্বাইতে ৮৬টা, মহারাষ্ট্রে অন্যান্য অঞ্চলে ১২টা, পণ্ডিচেরিতে ১৫-২০টা মোবাইল টাওয়ার খুলে নিতে হয়েছে। আরও বলেছেন, 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন প্রোটেকশন্' (আইসিএনআইআরপি)-এর বেঁধে দেওয়া বিকিরণ সীমা প্রতি মিটার স্কোয়ারে ৪.৫ ওয়াট-এর চাইতেও এক দশমাংশ কম বিকিরণ এদেশের মোবাইল টাওয়ার থেকে নির্গত হওয়ায় নাকি আদৌ কোনো ভয় নেই। টেলিকম দপ্তরের 'টার্ম সেল' সেটা নাকি নিয়মিত পরীক্ষাও করেন। বলেছেন, 'কল ড্রপ' আটকাতে আরও ৩০ শতাংশ নতুন টাওয়ার বসানোর প্রয়োজন। টাওয়ার বসানোর প্রক্রিয়া নাকি জটিল, নানা ধরনের শংসাপত্র যোগাড় করতেই নাকি অনেকটা সময় লাগে। ওনার বোধহয় জানা নেই যে, সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে কলকাতার বুকে চালু থাকা বহু টাওয়ার কেবল জরিমানা দিয়েই পরবর্তীতে অনুমোদন সংগ্রহ করেছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই আধিকারিকের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, তড়িৎ চুম্বকীয়

বিকিরণ সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, স্পঞ্জ আয়রন দূষণ, গঙ্গা দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে ৪২টি পরিবেশ সংগঠনের মুক্তমঞ্চ 'সবুজ মঞ্চ'-র সাংবাদিক বৈঠকের বক্তব্য ততটা গুরুত্ব কখনও পায়নি।

সাংবাদিক বৈঠকে পেশ করা বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, 'আইসিএনআইআরপি'-র গাইডলাইনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের কার্যবিবরণীর বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। সেই সংস্থার 'ফান্ডিং' বা সদস্যপদের মাপকাঠিও জানা যায় না। দ্বিতীয়ত, জানানো হয়েছে টেলিকম দপ্তর বিকিরণের উর্ধ্বসীমা আগের চাইতে (প্রতি মিটার স্কোয়ারে ৪.৫ ওয়াট) এক দশমাংশ কমিয়েছেন (৯০০ মেগাহার্টজ পর্যন্ত প্রতি মিটার স্কোয়ারে ০.৪৫ ওয়াট)। এটা অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। প্রশ্ন হল আগের নির্ধারিত সীমার কারণে কতজন শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তার কোনও 'ডাটা' কি সংগৃহীত হয়েছে? আরও বেশি সংখ্যক টাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে 'কল ড্রপ'-এর উল্লেখ হয়েছে। ঘটনা হলো, বর্তমান নির্ধারিত সীমার চাইতেও অনেক কমে অনেক দেশে পরিষেবা দেওয়া হয়। যেমন, 'অস্ট্রিয়া' যদি .০০০১ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার-এ কমিউনিকেশন চালাতে পারে, তাহলে এখানে তার চাইতে অনেক উঁচু মাত্রায় বিকিরণ হওয়া সত্ত্বেও কেন কমিউনিকেশন চালানো যাবে না? এখনকার ডিভাইস্ তো অনেক শক্তিশালী। এমন কি মাইনাস ১২০ ডিবিএম (মিলি ডেসিবল) পাওয়ারে যথেষ্টই কাজ করতে পারে। কারণ পাওয়ারফুল অ্যামপ্লিফায়ার রয়েছে, 'অটো গেইন কন্ট্রোলার'ও যথেষ্ট শক্তিশালী। ফলত, সামান্য পাওয়ারেই তো কমিউনিকেশন্ চলতে পারে। যুক্তি খাড়া করতে 'হু' (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) কী বলেছে সেটাও প্রচারে আনা হয়। আচ্ছা 'হু'-র এরকম কোনও নির্দেশ কী আপনার জানা আছে যে, ব্যবসার প্রয়োজনে যেখানে সেখানে যত খুশি মোবাইল টাওয়ার বসানো যেতে পারে সাধারণ মানুষের সম্মতি ছাড়াই? এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টাওয়ার নির্মাণের অনুমোদন ক্ষমতা পঞ্চায়েত প্রধান বা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের হাতে কি থাকা উচিত? গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে চূড়ান্ত গোপনীয়তা আর ধোঁয়াশাপূর্ণ বিবৃতি। বিকিরণ ব্যাপারটা কী, এর ভালোমন্দ কোনো দিকই আপনার সামনে আনা হবে না। কোন্ টেকনোলজিতে আপনি পরিষেবা পান সেটাও জানানো হয়না। তাহলে আমরাই আমাদের মতন করে জানার চেষ্টা করি।

প্রথমে গ্রাহক পরিষেবার বিষয়টা সংক্ষেপে বোঝা যাক। মোবাইল ফোনের কমিউনিকেশন্ সিস্টেমটা চলে তরঙ্গের মাধ্যমে। একে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ, যা এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সেই তরঙ্গটি কতটা শক্তি বহন করছে তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে তার শক্তি তত বেশি। মাইক্রোওয়েভ আবার জলের ওপর আপতিত হলে জলের অণুর স্পন্দন শুরু হয় এবং এর ফলে জল উত্তপ্ত হয়ে যায়। এই নীতিই ব্যবহৃত হয় মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ আবার দুই প্রকারের। প্রথমটা হল 'আইআর' (আয়োনাইজিং রেডিয়েশন)—যে বিকিরণে মানুষের শরীর সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে। দ্বিতীয়টি হল 'এনআইআর' (নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন)— যার বিকিরণে শরীরে চাক্ষুষ কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত বিকিরণ 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের' উপর দীর্ঘকালীন প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে শরীরে স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। যে অংশে জলীয় পদার্থ বেশি তাতে প্রভাব পড়ে বেশি। শরীরের চামড়া শুকনো হয়ে পড়ে, চোখে প্রভাব পড়ে, ফুসফুসে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় (ড: গিরীশকুমার, আইআইটি, মুম্বাই)। এসব হলো অ-তাপীয় (নন-থার্মাল) প্রভাব যা অনেক বেশি ক্ষতিকর। সে কারণে গ্রাহকের উচিত দৈনিক ১৮ থেকে ২৪ মিনিটের বেশি মোবাইল ব্যবহার না করা। কারণ একটি সেলফোন সাধারণত ১ থেকে ২ ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি ধারণ করে। এদেশে অ-তাপীয় প্রভাব নিয়ে গবেষণার খবর খুব একটা জানা যায়নি। শুধুমাত্র 'আই বল' শক্ত হচ্ছে কিনা বা জমে যায় কিনা এটা নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে। আপনি যদি সূর্যের দিকে ৩০ সেকেণ্ড একভাবে তাকিয়ে থাকেন, তাহলেই শরীরে তার প্রভাব বুঝতে পারবেন। তাতে 'আই বল' শক্ত হয় না বা জমে যায় না। তাই ধারাবাহিক গবেষণা দরকার, মামুলিভাবে নয়।

এবার আসা যাক মোবাইল টাওয়ার-এর গঠন প্রসঙ্গে। টাওয়ারে গোলাকার যে অ্যান্টেনা দেখেন সেটা দিয়ে 'লাইন অফ সাইট' কম্যুনিকেশন চলে। পাওয়ার থাকে সাধারণত ২ ওয়াট। তার সঞ্চারের সীমানা কম বেশি ৩০ কিমি দূর পর্যন্ত। আর কম্যুনিকেশন্ সিস্টেম চলে খাড়া থাকা অ্যান্টেনার সাহায্যে। যার পাওয়ার থাকে ২০ ওয়াট। 'বিটিএস' (বেস ট্রানসিভার স্টেশন)-গুলো সেই ক্ষমতা অনুযায়ীই তৈরি হয়। যেটা সেক্টর, চ্যানেল অনুযায়ী ভাগ করা থাকে। সেক্টর হচ্ছে কোন্ অঞ্চলে দেবে আর 'ফ্রিকোয়েন্সি' বা কম্পাঙ্কের হিসেবে থাকে চ্যানেলের ক্ষমতা। একই কম্পাঙ্কে যে মাত্রায় তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ ঘটে, সৌরজগৎ থেকেও সেই মাত্রায় বিকিরণ আসেনা। সূর্য থেকে যে পরিমাণ বিকিরণ হয় সেটা কিন্তু মারাত্মক। তবে আমাদের বায়ুমণ্ডল রয়েছে, জলীয় বাষ্প রয়েছে, রয়েছে ফিল্টার করার মতো 'ওজোন' স্তর। তারা বেশ কিছু বিকিরণ শুষে নেয়।

মানুষ বা বলা চলে মুনাফার লোভ এখন প্রকৃতির উপর খবরদারি ফলাতে চায়, চায় পাহাড় নদীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে। মজাটা হচ্ছে মোবাইল হ্যান্ডসেটের ক্ষেত্রে 'এসএআর'

(স্পেসিফিক অ্যাবসরপশন রেট) আবশ্যিক করা হয়েছে। টাওয়ারের বেলায় 'এসএআর' না বলে বলা হচ্ছে 'ইনটেনসিটি'। বলা হচ্ছে 'ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার'। টেলিকম দপ্তর ধরেই নিচ্ছে টাওয়ারের সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। 'এফসিসি'-র (ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন) নিয়মানুযায়ী টাওয়ারের সামনে উপস্থিতিটাই বর্জনীয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এখানে কোনও 'নিরাপদ সীমা' নেই। ২০১৩ সালের ৬ই মার্চ পার্ক স্ট্রীটের কারনানি ম্যানসনের ছাদে পৌঁছে দেখেছি যে ছাদে থাকা কমবেশি ৮০টি পরিবার (বাচ্চা সহ) 'ডেঞ্জার নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন' বলে যে নির্দেশিকা রয়েছে তার পাশে বাস করছেন। যে ছাদে ৩৮টার মতো অ্যান্টেনা লাগানো রয়েছে, সেখানে বৃদ্ধের হাত ধরে ছোট্ট বাচ্চা জীবনের প্রথম হাঁটা শিখছে। ছাদের ওপর অস্থায়ী অ্যান্টেনা রয়েছে, নিচতলার কোনও ফ্ল্যাটের জানলার পাশেই অ্যান্টেনা ঝুলতে দেখেছি। পরে জানা গেছে, শুধু ছাদ নয়, গোটা বাড়ি ঘিরে ৭৮টা অ্যান্টেনা লাগানো রয়েছে। দেখা যায় বিকিরণের উপর নজরদারি যাঁরা করেন ও যাঁদের উপর নজরদারি চালানো হয় দুজনেই হাসিমুখে রয়েছেন।

সাধারণ মানুষ ভাবেন অ্যান্টেনার মুখ যে দিকে থাকে, তার উল্টোদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা কম। আবার টাওয়ারের চারপাশ ঘিরে অ্যান্টেনা থাকলে তাঁরা ভয় পান। জানা গেছে, এক্ষেত্রে ৪টা পর্যায় আছে। প্রথমত, টাওয়ারটা আমার থেকে কত দূরে ও তাতে কটা অ্যান্টেনা আছে। অ্যান্টেনাগুলোর 'প্যাটার্ন' বা বিন্যাস, 'গেইন' বা বিবর্ধন ক্ষমতা কতটা বেশি। ছাদে বসানো মানেই 'নিয়ার ফিল্ড' বা খুব কাছাকাছি থাকার কারণে আপনিও অ্যান্টেনার একটা অংশ হয়ে গেলেন। অ্যান্টেনাগুলো যেভাবে লাগানো থাকে তাতে তাদের বিকিরণ ক্ষমতা ২০ ওয়াট হতে পারে আবার ১০০ ওয়াটও হতে পারে। কিন্তু 'বিটিএস'-এর ক্ষমতা করা আছে ২০ ওয়াট। এই 'আছে' শব্দটা একটু গোলমেলে। স্বচ্ছতা থাকলে স্থানীয় 'পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি অনুমোদন দেওয়ার সময় 'বিটিএস' নং, নির্মাণকারীর নাম ও ধারণক্ষমতা সাধারণ মানুষজনের কাছে ঘোষণা করত। আপনি ওনাদের কাছ থেকে 'ক্যালিব্রেটেড স্ট্যান্ডার্ড হ্যান্ড হেল্ড সেন্সর মিটার' নিয়ে এসব বোঝেন এমন প্রতিবেশীর সহায়তায় মাঝে মাঝে নিজেরাই বিকিরণের উর্ধ্বসীমা মেপে নিশ্চিত হতে পারতেন। 'আইসিএনআইআরপি'-র গাইডলাইন অনুযায়ী 'শর্ট টার্ম এক্সপোজার'-এর কথা বলা আছে। কিন্তু আপনার বাড়ির সামনে যে টাওয়ারটি চালু রয়েছে, সেটি ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টাই চলে। আরেকটি বিষয় হলো, এদেশে 'শর্ট টার্ম' বলতে ৬ মিনিটের হিসেব ধরা হয়। ৬ মিনিট কি আদৌ স্বল্পমেয়াদি হতে পারে? তাহলে তো বিদ্যুতের ঝলকানিকেও নিরাপদ বলতে হয়। কারণ ওটা তো ৬ মিনিটের অনেক কম সময় ধরে স্থায়ী হয়।

অ্যান্টেনা বস্তুটি নিজেই 'ফোকাসিং'-এর কাজ করে, অর্থাৎ একটা বিশেষ দিকে 'ফোকাস' করে পাঠানোই তার কাজ। একটু পরিষ্কার করে বোঝালে বিষয়টা এইরকম : আপনি যে টর্চ ব্যবহার করেন তার 'এলআইডি' সর্বোচ্চ থাকে ২ ওয়াট। কিন্তু আসল ক্ষমতা অর্থাৎ আলো কতদূর যাবে ও তার 'ইনটেনসিটি' বা তীব্রতা কতটা হবে সেটা নির্ভর করছে ভেতরকার 'রিফ্লেক্টর'-এর উপর। সেটা 'প্যারাবলিক' হয়। প্যারাবোলার নিয়মানুযায়ী সমান্তরাল যদি কোনও আলো থাকে, তাহলে তার 'ফোকাসে' সেটা একটা বিন্দুতে মিলিত হয়। বড় গোল অ্যান্টেনা যেটা দেখা যায়, সেটা ঐ 'রিফ্লেক্টর অ্যাঙ্গেল' মতো বানানো হয়। এই অ্যান্টেনাগুলোর 'গেইন' কম। 'রিফ্লেক্টর' দিয়ে সাধারণত গেইন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। একটা দিকে যতটা 'ফোকাস' করা যাবে, তার গেইন ততটা বেশি।

বলা হয়ে থাকে 'সেফ ফ্রিকোয়েন্সি', 'সেফ চ্যানেল'। দুটো অ্যান্টেনা দুটো বিপরীত মুখে যদি 'ডি' দূরত্বে বসানো হয়, তাহলে দুটির মধ্যে যে ফারাক তার মধ্যেও রয়েছে আরও একটি বিষয় যেটাকে বলা হয় 'আরএ ফ্যাক্টর', সেটা দিয়েও অ্যান্টেনার 'গেইন' বাড়িয়ে নেওয়া যায়। যদি ফ্রিকোয়েন্সি একই হয়, চ্যানেলও এক হয় তাহলে একটা 'পাওয়ার ডিভাইডার' দিয়ে ওনারা ইচ্ছে করলেই 'পাওয়ার ডিভিশন' করতে পারেন। সহজ করে বললে বলা যায়, ধরা যাক ১০ ওয়াট, দুটো ডিভিশন করা হলো ও ২০ ওয়াটই দেওয়া হলো— 'ডি' দূরত্বে (১ মিটার দূরত্বে দুটো খাড়া অ্যান্টেনা) সাথে সাথে যে 'এফেক্ট' দেবে, সেটা ২০ ওয়াটই রইল। কিন্তু দুটো অ্যান্টেনা হবার কারণে গেইন আগের চাইতে অনেক বেড়ে গেল অর্থাৎ ফোকাসিং করার ক্ষমতাও বাড়ল।

টাওয়ার থেকে বিকিরণের কারণে আদৌ ভয় আছে কি? থাকলে কতটা, সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন, ব্যবহারকারীরা কী মনে করেন ইত্যাদি বিষয়ে একটা ধারণা পেতে বহুদিন যাবৎ সেই মনোভাব লক্ষ্য করেছি। কেউ ভাবছেন টাওয়ার না থাকলে যোগাযোগের কী হবে? কারোর মনে হয়েছে 'হাই মাউন্টেড' হলে (১৫০ ফুট) বিকিরণ কমানো যাবে। কারোর সন্দেহ রয়েছে বিকিরণের ওঠানামা 'নারডা' মেশিন দিয়ে ঠিক ঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব কিনা এটা নিয়ে। তাঁদের যুক্তি, মানুষজন যখন অনেকক্ষণ কথা বলেন তখন তার 'ইনটেনসিটি' বাড়ে কমে, সেটা গড় 'ব্রড ব্যান্ড' অনুযায়ী হয়। শুধুমাত্র 'নিয়ার ফিল্ড'-এ শক্তির হিসেব করলে সেটা সার্বিক অর্থে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। অনেকে 'পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড'-এ চিঠিচাপাটি করার পর গোলশূন্যভাবে প্রতিবাদের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এক গৃহবধূর আক্ষেপ হলো, ফ্ল্যাট বুক করার সময় টাওয়ারের অস্তিত্ব না

থাকলেও হস্তান্তরের সময় ছাদে নির্মিত মোবাইল টাওয়ার সম্পর্কে প্রোমোটারের বক্তব্য ছিল ছাদের মালিকানা তাঁর নিজের। পার্ক স্ট্রীটে কারনানি ম্যানসনের এক রাজস্থানী মহিলা, যাঁর জানলার তিন ফুট দূরত্বে একটা অ্যান্টেনা ঝোলানো ছিল, তাঁর ভাসুর, দেওর, স্বামী তিনজনই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। একজন 'ব্রেন স্ট্রোকে' আক্রান্ত, বাকি দুজনের হার্টের ব্যাধি। সামাজিক দায়বোধের জায়গা থেকে সাথে সাথে 'টার্ম' সেল-এর কাছে বিষয়টা জানানো হয়েছিল।

নিছক বিরোধিতা নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে আমাদের অপরিণামদর্শিতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন না তুলতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হোন, কল্যাণকামী টেকনোলজির প্রয়োগ ও প্রসারে। আহ্বান রাখছি গবেষক, সমাজকর্মী, ছাত্র-বন্ধুদের কাছেও। 'আলোকের এই ঝরণাধারায়' স্নাত হোক জীবনবোধ।

অচ্যুত সেনগুপ্ত

মোবাইল টাওয়ার বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

এক

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কয়েক লক্ষ মোবাইল টাওয়ার মাটির উপরে, বসত বাড়ির ছাদে বিরাজ করছে উন্নয়নের ফানুস উড়িয়ে। ২০১১ সালে আমাদের দেশে মোবাইল টাওয়ারের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ, এর অনুষঙ্গে ২০১১ সালে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি। যত দিন যাচ্ছে মোবাইল টাওয়ার, মোবাইল ব্যবহারকারী এবং মোবাইল সেটের ও 'কোয়ালিটির' সংখ্যা এবং মোবাইল ব্যবহারের সময়সীমা বেড়েই চলেছে। ২জি স্পেকট্রাম বণ্টন নিয়ে দুর্নীতি সামনে এসেছে। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম ৪জি টেলিকম পরিষেবা চালু হতে চলেছে। পরিষেবক মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স। আসরে নেমে পড়েছে এয়ারটেল সংস্থাও। ৪জি পরিষেবার জন্য রিলায়েন্স কলকাতা শহরে বসাবে ২ হাজার নতুন মোবাইল টাওয়ার, রাজ্যে অন্তত ৩ হাজার। এয়ারটেলও বিপুল সংখ্যায় টাওয়ার বসাবে। ক্রমে ক্রমে আসরে নামবে অন্যান্য টেলিকম সংস্থাগুলিও। বিলগ্নিকরণ-বেসরকারিকরণে গভীর আস্থা রেখে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিকম সংস্থা 'বিএসএনএল'-এর ৪ হাজার মোবাইল টাওয়ার ব্যবহার করার চুক্তি করল মুকেশ আম্বানির সংস্থা *রিলায়েন্স জিও*; মাটিতে বসানো টাওয়ার ও বাড়ির ছাদে বসানো টাওয়ারের জন্য *রিলায়েন্স জিও*-কে ন্যূনতম মাসিক ভাড়া দিতে হবে যথাক্রমে ৩৮০০০ টাকা ও ২৪৯০০ টাকা। প্রথম ৩ মাসে ১০০০ টাওয়ার ভাড়া নিলে পাঁচ শতাংশ ডিসকাউন্টও পাবে তারা। *রিলায়েন্স জিও* ভারতী এয়ারটেল, রিলায়েন্স কমিউনিকেশন ও ভিয়োমের সঙ্গেও চুক্তি করেছে। এক বাক্যে এসবের সঙ্গে যা যা যুক্ত অর্থাৎ বিক্রেতাদের পকেট স্ফীত হওয়া ও সবারই শারীরিক মানসিক ক্ষতি হওয়া বেড়েই চলেছে, চলছে, চলবে। কিন্তু মোবাইল ফোন নেই বলে অথবা ব্যবহার করেন না বলে মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ জনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে মানুষ তো কোন্ ছার, প্রকৃতিরও রেহাই নেই।

মোবাইল সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি বা বিপদ নিয়ে বছর ৮-৯ আগে পর্যন্ত জনমানসে বিশেষ একটা হেলদোল ছিল না। মোবাইলের বিপদ নিয়ে অবশ্য কিছু ধ্যান-ধারণা চালু ছিল। যেমন : ১) মোবাইল টাওয়ারের জন্য চড়ুই পাখির সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, (২) মোবাইল টাওয়ারের জন্যই ডাব/নারকেলের খোলার ক্ষতি ও শাঁসের পরিমাণ হ্রাস, (৩) বাজ পড়ার সময় মোবাইল ফোন চালু রাখলে বিপদ, (৪) বুকের কাছে মোবাইল ফোন রাখলে হার্টের সমস্যা হতে পারে, (৫) বেশিক্ষণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে শ্রবণ শক্তি কমে যাবে, (৬) কোমরে মোবাইল ফোন গুঁজে রাখলে শুক্রাণু কমবে, ইত্যাদি।

দুই

এই ধ্যানধারণাগুলো সম্বল করেই ২০১১ সালে লোকালয়ে, বসতিবাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসানোর ক্ষেত্রে রাজ্য পরিবেশ দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশনামা চেয়ে এবং কাটোয়া পৌর এলাকায় লোকালয় ও বাড়ির ছাদে কতগুলি মোবাইল টাওয়ার আছে এবং প্রত্যেকে যথাযথ অনুমতি নিয়েছে কিনা, অনুমতির শর্তাবলী পালন করছে কিনা তা জানার জন্য কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারপার্সন, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মেম্বার-সেক্রেটারি ও রাজ্য পরিবেশমন্ত্রীকে তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী এপিডিআর কাটোয়া শাখার তরফে আবেদন করি। কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারপার্সন প্রতিটি আবেদনের উত্তর দিলেও, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্যাধিকারিক সর্বশেষ 'আরটিআই' আবেদনের প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়ে এই আইনের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করে উত্তর দিয়েছেন। পরিবেশমন্ত্রী উত্তরই দেন নি (মন্ত্রী বলে কথা!)। প্রথমে 'আরটিআই' আবেদনের বিষয়গুলি, তৎসঙ্গে সেগুলির জবাব এবং এই জবাবের মধ্যে সরকারি নির্দেশাবলীর কিছু কিছু অংশ নিয়ে বলি।

কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারপার্সনের (১৯.১০.২০১১ থেকে ১৫.০৫.২০১৩) জবাবগুলি সংক্ষেপে এইরকম : ১) মোবাইল টাওয়ারের প্রকল্প পথে রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের নির্দেশনামা (No. EN/939/T-IV-I/001/2006, Dt. 24.6.2008) বাংলায় বিজ্ঞাপিত

করার আবেদন কার্যকর করাতে পারেনি কাটোয়া পৌরসভা; ২) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের বিধিবদ্ধ নির্দেশনামা (Memo No./3060/5L/WPB/200B/M-15, dt. 6.9.2010) অনুযায়ী মোবাইল টাওয়ার বসানোর পর প্রতি বছর তার নির্মাণগত স্থিতি নিয়ে শংসাপত্র স্থানীয় প্রশাসনকে জমা দেওয়ার বিষয়টি এই লেখা পর্যন্ত কার্যকর করাতে পারেনি কাটোয়া পৌরসভা, এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আইনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও; ৩) 'আরটিআই' আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের উত্তর (Memo No: 767/IM-79/2010 (Part-1) dt. 21.3.2011) অনুযায়ী যে কোনো মোবাইল টাওয়ার কোম্পানির মোবাইল টাওয়ার বসানোর আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও 'বিএসএনএল' কাটোয়ার রেগুলেটেড মার্কেটে মোবাইল টাওয়ার বসানোর আগে অনুমতি নেয়নি এই বিষয়ে কাটোয়া পৌরসভা কেন আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়নি, তার জবাবে কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন জানাচ্ছেন— 'বিএসএনএল' কর্তৃপক্ষকে বারবার নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিরও এমন অনুমতিবিহীন টাওয়ারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এই বেআইনি টাওয়ারগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে। অর্থাৎ সরকারি সংস্থাগুলি নিজেরাই আইন মানছে না। ৪) দমকলের ছাড়পত্র নেওয়ার প্রশ্নে কাটোয়া পৌরসভার উত্তর : দমকল সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ছাড়পত্র আছে কিনা দেখা হচ্ছে; (৫) পৌরসভার চেয়ারপার্সন জানাচ্ছেন—২০০৯-১০ থেকে Central Valuation Board কর্তৃক অবস্থান নির্বিশেষে (মাটির উপরে/বাড়ির ছাদে) প্রতিটি টাওয়ারের বার্ষিক ট্যাক্স ১৬,২০০ টাকা; ৬) মোবাইল টাওয়ারের দূষণ সম্পর্কে সমগ্র পৌরবাসীর স্বার্থে প্রচারাভিযান চালাবার বিষয়ে 'আরটিআই' আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারপার্সন জানাচ্ছেন— মোবাইল টাওয়ারের দূষণ সম্পর্কে পরিবেশ দপ্তরের নির্দেশনামা পাওয়ার পর পৌরসভা থেকে পৌরবাসীদের স্বার্থে প্রচারাভিযানের ব্যবস্থা করা হবে। নাগরিকদের স্বার্থে নয়, 'পরিবেশ দপ্তরের নির্দেশনামা পাওয়ার পর' প্রচারাভিযান চালাবে। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ বলছে যে পর্যদের আইন অনুসারে মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ দূষণ হিসেবে স্বীকৃত নয়! (Memo No. 1200-5L/WPB-2008 dt. 19.8.2013) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চেয়ারপার্সন কর্তৃক উত্তর না দেওয়া প্রশ্নগুলি ছিল : ক) নিকটবর্তী বাড়ি থেকে টাওয়ারের নিম্নতম দূরত্ব ৩ মিটার রাখার বিধি কি মানা হয়েছে? খ) সরু গলির মধ্যে মোবাইল টাওয়ার বসানো ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা কি পালন করা হয়েছে? গ) টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের জন্য কি বিকিরণ থেকে সুরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? ঘ) মোবাইল টাওয়ার কোম্পানিগুলি কি বাড়ির ছাদে ও লোকালয়ে টাওয়ার বসানোর সময় গৃহকর্তা ও এলাকার নাগরিকদের মোবাইল টাওয়ারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানিয়েছে? যে এলাকায় বা যে বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসানো হয় সেখানে মোবাইল টাওয়ার বসানোর আগে আশেপাশের বাসিন্দাদের অনুমতি নেওয়ার কোনো অর্ডার রাজ্য পরিবেশ দপ্তর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের নেই। যে কাজ নয়াদিল্লীর মুখ্যসচিব করতে পারেন (১০.১.২০০৮) সেই কাজ সচেতনভাবে বর্জন করেছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নেতৃত্বাধীন পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের আদেশ জারি করার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমতি নেওয়া সংক্রান্ত অংশটি বাদ রেখে আদেশটি জারি করেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। বর্তমান 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকারের মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের নির্দেশ (4.9.2013 তারিখের No. 406/MA/o/c-4/3R-9/202) সামান্য করের বিনিময়ে টাওয়ার বসানোর বিষয়টিকে মান্যতা দিয়েছে।

২০০১ সালের ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত কাটোয়া পৌর এলাকায় বসানো মোবাইল টাওয়ারের সংখ্যা ২১টি, তন্মধ্যে ১২টি মাটির উপরে এবং ৯টি বাড়ির ছাদে। প্রস্তাবিত ৪টি। তার মধ্যে ১টি বাড়ির ছাদে, বাকি ৩টি মাটির উপরে।

মোবাইল টাওয়ার বসানো নিয়ে রাজ্য সরকারের যে সমস্ত নির্দেশ কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন কার্যকর করেন নি তারই প্রতিকার চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের মেম্বার-সেক্রেটারির কাছে আবেদন করি (৫.৬.২০১৩)। উত্তর আসে, তাঁরা এর উত্তর দিতে অপারগ। এই উত্তর পাবার আগেই (১১.৯.১৩) পর্যদের কাছে 'আরটিআই' আইন মোতাবেক প্রতিকার চেয়ে আবেদন করি। এর উত্তরে পর্যদের মুখ্য তথ্যাধিকারিক এই আবেদনের যে উত্তর পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের তথ্যাধিকারিক শ্রী অরূপ গুছাইত দিয়েছেন, তা তথ্য জানার অধিকার আইনের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ। শ্রী গুছাইত লিখেছেন, (Memo No. 3204/IM-3/2010, Dt 23.9.13) তিনি ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কোনো সংগঠনের প্রতিনিধির উত্তর দেবেন না, এক্ষেত্রেও দেন নি।

এই উত্তর পাবার পর আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৮.১০.১৩ তারিখে আধিকারিকের এই অপব্যাখ্যা ও অপ্রয়োগকে খণ্ডন করে চিঠি দিয়েছি, আবারও আবেদন করেছি উত্তর দেবার জন্য। উত্তর না পেয়ে আমরা রাজ্যের সর্বোচ্চ সংস্থা, মুখ্য তথ্য কমিশনের কাছে আবেদন করি, তাগাদাও দিই (২.৭.২০১৪)। এখনও পর্যন্ত উত্তর আসে নি।

ইতিমধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবাদে আমি যেখানে বাস করি সেই কাটোয়া স্টেডিয়াম আবাসনের অধিবাসীদের

নিয়ে অধিবাসী হিসাবে এই বছরের এপ্রিল মাসে মোবাইল টাওয়ার স্থাপন বিরোধী এক আন্দোলন গড়ে তুলি। গণ-আবেদনে অনেকে সই দিলেও পাশে ২/১ জন ছাড়া কাউকে পাই নি, ভয় অন্যতম কারণ। 'অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিয়ে আলাদা আবেদনও করানো সম্ভব হয়েছে। এই আবাসনে ২০০৮ সালে বাড়ির ছাদে একটি মোবাইল টাওয়ার স্থাপিত হয়েছে। আবার, ১ কাঠা জমির উপর তিনতলা একটি বাড়ির ছাদে, যার চারপাশে নিজস্ব কোনো জায়গা নেই, আছে বসত বাড়ি, মোবাইল টাওয়ার বসানো হয়ে যাওয়ার পর (এখনও চালু হয়নি) এই আন্দোলনের শুরু। আবাসনবাসীদের 'গণ-আবেদন' এবং 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের' আবেদনের মূল সুর— ১) মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণজনিত ক্ষয়ক্ষতি; ২) একটি মোবাইল টাওয়ার থাকা সত্ত্বেও আর একটি কেন; ৩) ঐ রকম ১ কাঠা জমির তিনতলা বাড়ির ছাদের মোবাইল টাওয়ার কোনো কারণে ভেঙ্গে পড়লে জীবনহানির সম্ভাবনা; ৪) এই দুটি মোবাইল টাওয়ারের দূরত্ব আকাশপথে আন্দাজ ১৫০ ফুট; ৫) আবাসনের মধ্যে আছে একটি প্রাইমারি স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, আবাসনের ঠিক বাইরে একদিকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও চাইল্ড লেবার স্কুল ও অপরদিকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এসব বিবেচনা করে যে মোবাইল টাওয়ারটি চালু হয়নি তা যেন চালু না হয় ও খুলে ফেলা হয় এবং ২০০৮ সালে বসানো টাওয়ারটিও সরানো হয়। এই সমস্ত উল্লেখ করে কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারপার্সন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এলাকার বিধায়ক, মহকুমা শাসক ও 'এসডিপিও', পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদ এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে জানানো হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের উত্তর (Memo No-0635-5L /WPB/ 2008 dt. 11/0714), তারা কিছু করতে অপারগ। পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সচিব জানান যে তাঁরা 'দূষণ পর্ষদ'-কে ৪ সপ্তাহের মধ্যে সক্রিয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ করছেন।

তিন

এবার মোবাইল সংক্রান্ত যা জেনেছি সেগুলি যতটা সম্ভব সংক্ষেপে জানাচ্ছি। নিউইয়র্ক শহরে প্রথম সেলফোন পরিষেবা শুরু হয় ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে। এই পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে নিউইয়র্ক শহরে যেখানে বসানে হয়েছে সেলফোন টাওয়ার, এন্টেনা সেখানকার অধিবাসীরা এর বিকিরণ উদ্ভূত নানারকম রোগের— অনিদ্রা, ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, চোখের ব্যথা, গলা ফোলা, বমি বমি ভাব, নানা ধরনের ব্যথা-বেদনা প্রভৃতির শিকার হলেন। এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াবার সাথে সাথে শুরু হল আইনি লড়াই। আইনি লড়াইটা মূলত আমেরিকার 'ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন' নির্ধারিত 'নিরাপদ মাত্রা'র বিরুদ্ধে। সুপ্রিম কোর্ট ২০০১ সালে কোনো মন্তব্য না করেই মামলা খারিজ করে দেয়। একদিকে আদালতের মুখে কুলুপ আঁটা, অন্যদিকে টেলিকম কোম্পানিগুলোর পোষা বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলেন— সেলফোন নিয়ে চিন্তার কারণ নেই, এই প্রযুক্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এক্সরে-র ক্ষেত্রে যখন 'নিরাপদ মাত্রা' বলে কিছু নেই বা হয় না, সেখানে মোবাইল প্রযুক্তি কেমন করে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় এই প্রশ্ন জোরালো ভাবে উঠতে শুরু করল যা ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বের ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের দেশেও নানা স্তরে নানাভাবে প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ায় ২০১০ সালে ভারত 'ইন্টার-মিনিস্ট্রিয়াল কমিটি' তৈরি হয়; এই কমিটি ঘোষণা করে যে, যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে— সেলফোন টাওয়ার থেকে স্বাস্থ্যহানি ঘটছে সেহেতু মোবাইল টাওয়ার থেকে বিকিরণের অনুমোদিত সীমা/'রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি' এক্সপোজার লিমিট GSM 900 'ট্রান্সমিটিং ব্যান্ড' ৪.৭ ওয়াট/বর্গমিটার করার সুপারিশ করে। এরপরও প্রতিবাদ চলতে থাকায় ২০১২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বিকিরণের মাত্রা ১০ শতাংশ কমিয়ে ০.৪৩৪ ওয়াট/বর্গমিটার করার সুপারিশ করে। এই সীমাও যে তথাকথিত নিরাপদ মাত্রার নয় তা ২০১৩ সালের মার্চে এপিডিআর-এর তদন্তে উঠে এসেছে। ২৫এ পার্ক স্ট্রীটে কারনানি ম্যানসনের বাসিন্দারা বিকিরণের ফলে নানা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং কারনানি ম্যানসনের দুজন বাসিন্দা সহ APDR রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে স্মারকলিপিও জমা দেয়। মানবাধিকার কমিশনও অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে নির্দেশ জারি করে ২১ দিনের মধ্যে অভিযোগগুলির তদন্ত করে পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মকানুন ঠিকঠাক মানা হয়েছে কি না জানতে বলে (কাটোয়া আবাসনকারীদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন)।

২০১৩-র জুন মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ সারা কলকাতা জুড়ে একটা সমীক্ষা চালায়। দেখা যায় সর্বত্র মানুষ মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের শিকার হচ্ছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে— সমগ্র কলকাতা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের 'মাইন ফিল্ড'-এ পরিণত হয়েছে। আইআইটি খড়গপুরের ও আইআইটি মুম্বাইয়ের তিনজন বিজ্ঞানী রাজ্যের বর্তমান পরিবেশমন্ত্রীকে একই পাড়ায় দুটি মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণে টাওয়ার বসানোর ১৬ বছরের মধ্যে ক্যান্সারে নিহত নয় জনের নামের তালিকা সহ পেশ করেছেন 'রিপোর্ট অফ সেল ফোন টাওয়ার রেডিয়েশন হ্যাজার্ডস'। ৬.৬.১৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত— ''শহরাঞ্চলে মোবাইল টাওয়ার বসানোর ক্ষেত্রে আগেই কড়াকড়ি করেছিল রাজ্য। ...সম্প্রতি পঞ্চায়েত দফতরের বিশেষ সচিব রাজ্যের সব জেলাশাসককে চিঠি

পাঠিয়ে এই বিধি রূপায়ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।'' (এ ব্যাপারে শহরের জন্য এরকম কোনো নির্দেশিকার খবর জানা নেই বলেই ফোনে জানিয়েছেন কাটোয়া পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। কাটোয়া আবাসনকারীর তরফে আনন্দবাজারের এই কাটিংসহ চিঠিও দেওয়া হয়। এক কথায়, সরকার নির্বিকার।)

সরকার নির্ধারিত যে সীমা ০.৪৩৪ ওয়াট/বর্গমিটার-এর কথা আগে বলা হয়েছে তা কেবলমাত্র স্বল্পস্থায়ী বিকিরণের জন্য, কিন্তু টাওয়ারগুলো তো চালু থাকে ২৪ ঘণ্টা ৩৬৫ দিন। তাছাড়া সরকারি নির্দেশাবলী মানা হচ্ছে কিনা, যেমন টেলিকম বিভাগের অধীনে মোবাইল বিকিরণ পর্যালোচনার জন্য 'টার্ম সেল' (TERM–Telecom Enforcement Resource Monitoring) আছে তা টাওয়ার বসানোর সময় উপস্থিত থাকা উচিত প্রতিটি ক্ষেত্রে। বাস্তবে গড়পড়তা ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে তা 'চেকড্' হয়। এক্ষেত্রেও 'টার্ম সেল'-এর লোক আসার আগেই সব ঠিকঠাক করে রাখে। 'টার্ম সেল' রিপোর্ট দেয়, সব ঠিক আছে। তারপর 'বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর', অর্থাৎ তথাকথিত 'নিরাপদ মাত্রা'র বাইরে পরিষেবা (!) দিতে শুরু করে কোম্পানিগুলি।

আইআইটি-র বিজ্ঞানীরা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাঁদের সমীক্ষায় যেখানে মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণজনিত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব-নিকাশ পেশ করছেন সেখানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ (টেলিকম কর্পোরেশন কর্তৃক স্পনসর্ড) জানাচ্ছে— ডাবের খোলার ক্ষতি ও শাঁসের পরিমাণ হ্রাসের কারণ এক ধরনের Mite (অতি ক্ষুদ্র কীট)-এর উপদ্রব, মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ নয়। অথচ বিজ্ঞান ক্লাবের ছাত্রদের পরীক্ষায়— ডাবের কাঁদিতে মিহি তারের জালি বাঁধা আবরণ চতুর্দিকে বেঁধে এবং সেই তার আর্থ করে দেখতে পেয়েছে ঐ ডাব যখন বাড়ছে তার খোসায় কোনো দাগ নেই। স্পনসরড বিজ্ঞানীরা/গবেষকরা এরকমই হয়। (পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পক্ষেও এরকম সরকারি/স্পনসরড বিজ্ঞানীদের কথাও আমরা জানি।) একজন ব্যতিক্রমী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. জর্জ কারলোকে ১৯৯৩ সালে 'সেলুলার টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন' মোটা টাকার বিনিময়ে নিযুক্ত করেছিল— সেলফোন টাওয়ার নিরাপদ তা ঘোষণা করার জন্য। এজন্য তারা ৭ বছর যাবৎ ২৮ মিলিয়ন ডলার খরচও করে। কিন্তু ডা. কারলোর গবেষণালব্ধ বক্তব্য— মোবাইল ফোনে নজিরবিহীন বিপদের উপস্থিতির কারণে আমি ভীত। ওনাকে ওরা তাড়িয়ে দেয়।

'হু'র অন্তর্ভুক্ত 'ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ ইন ক্যানসার' ৩১.৫.২০১২ ঘোষণা করেছে— বেশি ব্যবহারকারী মোবাইল গ্রাহকেরা গ্লায়োমা (ক্যান্সারের টিউমার) ও অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা (কানে শোনা সম্পর্কিত স্নায়ুকোষের টিউমারে) শিকার হতে চলেছেন, কারণ ওই যন্ত্রটির ক্রিয়াকলাপে ওই সমস্ত ব্যাধির উপাদান আছে। প্রবীণ স্নায়ু চিকিৎসক তৃষিত রায় বলেন— ''যাঁরা পেসমেকার নিয়েছেন, তাঁরা বুকের ওই দিকে সেলফোন রাখবেন না। ওদিকের কানেও মোবাইল ধরে রাখবেন না।'' অনেক বিশেষজ্ঞের সুপারিশ— পেসমেকার থেকে মোবাইল ফোনের দূরত্ব কমপক্ষে ৫০ সেন্টিমিটার রাখা বাঞ্ছনীয়। একটা সেলফোনে ১ ওয়াট থেকে ২ ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি থাকে, সেজন্য একজন সেলফোন ব্যবহারকারীর দৈনিক ১৮ থেকে ২৪ মিনিটের বেশি দৈনিক ব্যবহার করা উচিত নয়।

পশুপাখীদের উপর মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণের কী প্রভাব সেই সম্পর্কিত গবেষণায় জানা যাচ্ছে, স্পেন এবং বেলজিয়ামের পাখিরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রবিন্দর কুমার কোহলি-র মতে, মানুষ যখন তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাবের সত্য সন্ধানে ব্যস্ত ততদিনে পাখীদের অন্তর্ধান ঘটে গেছে। তা ঘটেছে মৌমাছি ও চড়ুইয়ের ক্ষেত্রেও। ঐ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন, পাখিদের ডিম ও ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ এ থেকে সিদ্ধান্ত টানা যায়— যে সমস্ত মানুষ মোবাইলের ফোন ব্যবহার করেন না তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, হবেন। আইআইটি মুম্বাইয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং মোবাইল টাওয়ার বিকিরণ বিশেষজ্ঞ গিরিশ কুমার বলেছেন— ''দেখা গেছে এমনকি ১ মিলিওয়াট/স্কোয়ার মিটার বিকিরণও ৫/৭ বছর ধরে লাগাতার হতে থাকলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।''

আমরা অনেকেই জানি ডিজিটাল প্রযুক্তি, যেমন ডিজিটাল টিভি, কম্পিউটার প্রভৃতি থেকে তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ হয়। মোবাইল ফোনের 'কমিউনিকেশন সিস্টেমটা' চলে এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বা মাইক্রোওয়েভ মারফত। এটি 'নন আয়োনাইজিং', যার ক্ষতিকর প্রভাব বুঝতে অনেক সময় লাগে। (পরমাণু শক্তি থেকে বিকিরণ হল 'আয়োনাইজিং', যা বিকিরণের সাথে সাথেই সাংঘাতিক ক্ষতি করে)।

মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ মানুষের শরীরে ঢুকে শোষিত হয়। আগে চোখে প্রভাব পড়ে, ফুসফুসে প্রতিক্রিয়া হয় (ড. গিরিশ কুমার, আইআইটি, মুম্বাই)। সরকার Radio Frequency Exposer Limit নির্ধারণ করে দিলেও একটা মোবাইল টাওয়ার থেকে আর একটা দূরত্ব, অ্যান্টেনার সংখ্যা, উচ্চতা প্রভৃতি কিছু বেঁধে দিয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই (কেউ জানলে জানাবেন)। কিছু গবেষকের মতে এই দূরত্ব বসতবাড়ি এবং লোকালয় থেকে ১ কিমি হওয়া উচিত।

মোবাইল টাওয়ারের বিকিরণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ থেকে যেসব স্বাস্থ্যহানির বিষয় উঠে এসেছে সেগুলি হলো : ক্যান্সার, ব্রেন ক্যান্সার (প্রবণতা ৪০০ শতাংশ বেড়ে গেছে), হার্টের রোগ, স্নায়ুরোগ, থাইরয়েড, ডিএনএ-র ক্ষতি, স্মৃতিভ্রম, হাত-পা কাঁপা, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত, কানে কম শোনা, হজমের গন্ডগোল,

মেলটোনিন কমা, নাক দিয়ে রক্তপাত, অনিদ্রা, চর্মরোগ, ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, গা বমি বমি ভাব, ব্যথা বেদনা জ্বর যা দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাচ্ছে, ডায়াবেটিস প্রভৃতি। বয়স্ক ও শিশুদের, বিশেষ করে শিশুদের মস্তিষ্কের উপর ক্ষতির প্রভাব বেশি।

যে দেশে মোবাইল টাওয়ার বসানো এবং বিকিরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু নির্দেশ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই সেখানে প্রথমত যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং টাওয়ার বসানোর আগে গণ-প্রতিরোধ ও বসানো মোবাইল টাওয়ার সরানোর দাবিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার এবং গণ-জমায়েত, গণ-আন্দোলন, গণ-আন্দোলন, গণ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো 'মোবাইল' সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলা ও সাহসী হতে সাহায্য করা।

সুব্রত রায়চৌধুরী

সহায়তা ঃ বিজয় সরকার (আইএএমপি), অচ্যুত সেনগুপ্ত ও রঞ্জিত শূর (এপিডিআর), সবুজ মুখোপাধ্যায়, সংকেত সিংহ রায় এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

আরব বসন্তের অবসান ও আক্রান্ত মানব অধিকার

সম্প্রতি জানা গেল ইজিপ্টের জেলবন্দি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস সহ সব ধরনের অভিযোগ খারিজ করেছে ওই দেশের আদালত। চার বছর আগে ২০১১ সালের জানুয়ারিতে ইজিপ্টের তাহিরির স্কোয়ারে লাখো ইজিপ্টবাসী ছাত্র-যুবক-সাধারণ মানুষ এক ঐতিহাসিক জমায়েত করে দাবি তুলেছিল সে দেশের একনায়ক হোসনি মোবারকের তিরিশ বছরের অপশাসনের অবসানের। প্রশাসনের ব্যাপক দুর্নীতি, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের বিরাট মূল্যবৃদ্ধির অবসান ও একই সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাখো মানুষের সমাবেশ শক্তি পেয়েছিল পাশের দেশ টিউনিশিয়া থেকে। 'ওয়াল স্ট্রীট দখল করো' আন্দোলনও কিছুটা স্রোত এনেছিল বই কি! প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চলা ঐ জমায়েতের অনড় চাপে স্বৈরাচারী হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর নির্বাচনে জয়লাভ করে সর্ববৃহৎ আন্দোলনকারী দল 'ইসলামিক ব্রাদারহুড' দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতার দখল নেয়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই দেশের সেনাপ্রধান 'ক্যু'-র মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা দখলে নিয়েই প্রথমেই আরব-বসন্তের আন্দোলনকারী নেতাদের জেলে পাঠান। একই সাথে নির্বাচন পরিচালনাকারী 'ইসলামিক ব্রাদারহুড'-এর নেতাদেরও জেলের ভেতরে ঠাঁই হয়। এখন সেই সেনাপ্রধান 'সিসি'র পরিকল্পনায় হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে থাকা হাজার খানেক আন্দোলনকারীদের হত্যা করার অভিযোগ, চরম দুর্নীতির অভিযোগ ইত্যাদি সবই খারিজ করেছে ইজিপ্টের বিচারালয় এবং একই সাথে মোবারক ও তার দুই ছেলের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

এই ঘটনায় অন্যান্য আরব দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কেন না যে 'আরব বসন্তের' শুরু হয়েছিল টিউনেশিয়ায় ২০১০ সালের ডিসেম্বরে একজন সবজি বিক্রেতার পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে আগুনে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে সেই আন্দোলন প্রতিবাদী জনতাকে দেশের দীর্ঘ অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার করেছিল। আর এই জনতার রোষানলে পুড়ে যাওয়ার আগেই ২৭ বছরের ক্ষমতাসীন টিউনিশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক 'বেন-আলি' পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। একনায়কতন্ত্রের অবসানে প্রথমবার গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়। টিউনেশিয়ার প্রতিবাদী জনতার গণতন্ত্রের জন্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য ও স্বৈরাচারী শাসকের অপসারণের জন্য আন্দোলনের প্রতিধ্বনি পৌঁছায় সব আরব দেশে। কেননা এইসব আরব দেশগুলোর মূল সম্পদ হলো মাটির নীচের খনিজ তেল। সেখানকার জনগণ দেশের সম্পদের ন্যূনতম ভাগটুকুও পায় না। দেশের একনায়ক স্বৈরাচারী শাসক, রাজা, খলিফারা দেশ চালায় তেলের খনির উপর বসে, সেনাবাহিনীর লাঠি ও বন্দুকের শক্তিতে। কিন্তু আরব বসন্তের হাওয়া আটকাতে পারেনি কোন লাঠি-বন্দুকের শক্তি। ফলে লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, বাহরিন, সৌদি আরব, মরক্কো, আলজিরিয়া, জর্ডন, ওমান ও কুয়েতের মত দেশগুলি প্রতিবাদী জনতার আন্দোলনের বাইরে থাকেনি।

একই সময় লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মুয়াম্মর গদ্দাফি জনতার রোষের শক্তি উপলব্ধি করতে না পেরে সশস্ত্র আক্রমণ নামান। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি অবরোধ করে জনতা সরকারি বাহিনীর সাথে লড়াই চালায় ছটি মাসের জন্য। প্রতিবাদীদের সরকারি বাহিনীর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সম্মতিতে ন্যাটো-বাহিনী বিমান আক্রমণ চালায় লিবিয়ার সরকারি বাহিনীর উপর। একই সাথে বিভিন্ন আরব দেশের সম্মিলিত মিলিটারি বাহিনীও স্থলপথে লিবিয়া আক্রমণ করে। প্রায় চার দশকের গদ্দাফি শাসনের অবসান ঘটিয়ে গদ্দাফি লিবিয়া ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন এবং পথেই নিহত হন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, আসলে ন্যাটো-বাহিনীর সাহায্য ও আক্রমণ কাদের স্বার্থরক্ষার জন্য হয়েছিল? সে কি লিবিয়ার জনগণের সুবিধার্থে, না কি লিবিয়ার বিশাল তৈলখনিগুলিকে ন্যাটো-দেশগুলির মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করার জন্য? আফ্রিকার সর্ববৃহৎ তৈল ভাণ্ডার আছে লিবিয়ায়। এখনো সেখানে নির্বাচন হয়নি, চলেছে গৃহযুদ্ধ।

ইয়েমেন ছিল চতুর্থ দেশ যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানকে বিক্ষুব্ধ জনগণের চাপে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। তেত্রিশ বছর পর ২০১১ সালে একনায়কের ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে

রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি দখল করে মনসুর হাদি সে দেশের জনগণের মধ্যেকার অসীম দারিদ্র্য অবলুপ্তি করার লড়াইয়ে নেমেছেন।

অন্যান্য আরব দেশগুলির মধ্যে সিরিয়া, বাহরিনের ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান ও খলিফারা জনগণের রোষানলে পড়েন নি। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ রোধ করেই ওই দেশগুলিতে শাসন চলছে। আরব বসন্তের হাওয়া এই দেশদুটিতে কোন আন্দোলন তুলতে পারে নি।

এছাড়া আরব দেশগুলির মধ্যে সৌদি আরব, মরক্কোর ক্ষমতাসীন শাসকরা জনগণের রোষের আঁচ পেয়ে কেউ দেশের জনকল্যাণ-খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে (সৌদি-আরব), আবার কেউ রাজতন্ত্র থেকে সরাসরি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পরিবর্তনের পথ ধরে (মরক্কো) জনরোষে ঠাণ্ডা জল ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাকি চারটি দেশ। আলজিরিয়া, জর্ডন, ওমান ও কুয়েতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলজিরিয়া, যে দেশের জনগণ ফ্রান্সের ৩০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল জনযুদ্ধের ভেতর দিয়ে। কিন্তু তারপরও জনগণের গণতন্ত্র লাভ হয়নি, হয়নি দারিদ্র্য দূরীকরণ, ভাঙ্গেনি অপশাসনের কঠিন শৃঙ্খল। শ্রেণী সংগ্রাম যে কেন দরকার তা এইসব প্রতিটি দেশের জনগণের লড়াই থেকে আমরা সে শিক্ষালাভ করতে পারি। না হলে আলজিরিয়ার দীর্ঘ লড়াইয়েরই এক যোদ্ধা কীভাবে দেশীয় সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে জরুরি অবস্থা জারি রেখে ওই দেশের সংবাদপত্র প্রকাশের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার সহ সব মানবাধিকার হরণ করে রাখে! অবশেষে আরব বসন্তের হাওয়ায় উত্তাল জনগণের রোষের হাত থেকে মুক্তি পেতে রাষ্ট্রপ্রধান আবেদিন আজিজ বেটেফ্লিকা জরুরি অবস্থা তুলে নিতে বাধ্য হন। এই অবস্থা আমাদের নিজেদের দেশের কথা মনে পড়ায়।

অবশেষে প্রায় চারটি বছর চলা আরব বসন্তের ঢেউ থেমে আসে। জনসাধারণের প্রতিবাদী কণ্ঠকে থামানোর প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের অগণতন্ত্রপ্রিয় শাসকেরা এবার নতুন কৌশল নেয়।

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থামাতে এবারে প্রতিবাদী বা সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণকারী বিরোধী মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পথ নিয়েছে কয়েকটি আরব দেশ। আমাদের খুবই পরিচিত বাহমিন, কুয়েত ও ওমান। সেখানে 'আরব বসন্ত' ততটা হাওয়া তোলেনি, ফলে জোরদার প্রতিবাদী মিছিলের মুখও দেখা যায়নি ওই দেশগুলিতে।

কিন্তু আগেই জনসাধারণের আক্রমণের ভয় দেখাতে এবার কুয়েত সরকার তার সমালোচকদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিচ্ছে। সেই দেশে এই বছরে এখনো পর্যন্ত ৭৭ জন কুয়েতির নাগরিকত্ব কাড়া হয়েছে। বাহরিন, যে দেশের নানা চাকরির লোভে ভারত থেকে প্রচুর মানুষ যায়, সেই দেশে বিগত বছরে ৪০ জনের নাগরিকত্ব কাড়া হয়েছে। ওমান নতুন আইন জারি করে যেসব নাগরিক দেশের সরকারের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ করবে তাদের 'পাসপোর্ট' নাকচ করে দিচ্ছে। সৌদি আরবও একই পথে হাঁটার কথাই ভাবছে। অর্থাৎ বিরুদ্ধতার রাস্তা নেই, প্রতিবাদের কথা থাকবে না, দ্বিমত পোষণ করা চলবে না। সব 'হ্যাঁ-হুজুর' হতে হবে, তবেই থাকবে সেই দেশের নাগরিকত্ব। হীরক রাজার দেশের মতই অবস্থা।

বাহরিন আরেকটি দেশ যেখানে কোর্ট থেকে বলা হচ্ছে না-নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে বিচার করার কোন অধিকার নেই। কুয়েতেও একই আইনহীনতা। কুয়েতে বিরোধী স্বরের একটি টিভি চ্যানেলের অধিকর্তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে আহমদ-আল-শামরি তার টিভি স্টেশনটির অধিকারও হারিয়েছেন। তাঁর দোষ ছিল যে তাঁর চ্যানেলে সরকারি রাজকীয় আলি-সাবা পরিবারের মধ্যে 'ক্যু' এর মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা বদলের খবরটি ঘোষণা করা হয়েছিল। দ্বিমত পোষণ এখন ঐসব দেশে দেশদ্রোহিতা বা রাজদ্রোহিতার সমান।

এটা পরিষ্কার যে কেউ যদি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চায় তাহলে তার কথা বলা চলবে না, চুপ করে সব 'আদেশ' মেনে নেওয়াই হবে দেশপ্রেমী-র কাজ।

এই অবস্থায় প্রতিবাদী বা দ্বিমত পোষণকারীরা এই সব দেশে হয়ে উঠছেন না-নাগরিক, যাঁরা নাগরিকত্ব হারিয়েছেন, ফলে তাঁরা যে কোন সরকারি পরিষেবা নিতে অক্ষম। এমনকি তাদের সন্তানরাও না-নাগরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। এটা আমাদের রাজ্যে বা কেন্দ্রে বর্তমান শাসক দলের কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। বিরোধী পক্ষকে এক চালে বা এক আইনেই না- নাগরিক করে তুলতে পারলে রাজ্যটা বিরোধী শূন্য হতে পারে।

শুনলে আঁতকে উঠতেই হবে যে এক কুয়েতেই প্রায় এক লক্ষ না-নাগরিকরা আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের বলা হয় 'বাইদুন'। এই না-নাগরিকদের কোন দেশ নেই, কেন না তাঁদের জন্মভূমি তাঁদের নাগরিকত্ব কেড়েছে। এভাবে মানব-অধিকার হরণ করা হয়েছে বা হচ্ছে অসংখ্য গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের। কেননা আরব দেশগুলিতে 'বাইদুন' নামাঙ্কিত মানুষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে দেশদ্রোহী বলে, ফলে তাঁরা জীবন ও জীবিকার অধিকারও হারাচ্ছেন। কী হবে এইসব মানব-অধিকার হারানো না-নাগরিক মানুষদের? আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশ্ন তুলতে হবে এখনই। আন্তর্জাতিক মানব-অধিকার সনদের একটি বিশেষ ধারা হরণ করছে যে সব দেশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া দরকার। এই বছরের মানব-অধিকার দিবসের আহ্বান হোক এটাই।

তথ্যসূত্র

1. The Telegraph, 30-11-2014
2. The Indian Express, 20-11-2014
3. www.bbc.com/news/world/arab_uprising

তড়িৎ চৌধুরী

প্রবন্ধ

যুদ্ধ, শাস্তি থেকে রেহাই ও স্বাধীনতার খোঁজ

গৌতম নভলখা

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় (২৭ মে ২০১৪) প্রতাপ ভানু মেহতা তাঁর লেখায় নরেন্দ্র মোদীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে "নেহরুপন্থী ঐকমত্যের একটি বিরাট দুর্বলতা ছিল ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংশোধনে রাজদ্রোহ নিয়ে আইনগুলি থেকে শুরু করে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াকে খর্ব করার প্রচেষ্টা। এর ফলে নাগরিক অধিকার খর্ব করার জন্য একগুচ্ছ আইন তৈরি হয়েছিল।" ফলে নেহরুপন্থী রাষ্ট্র "শক্তিশালী হয়েছে নাগরিকদের (স্বাধীনতার) বিনিময়ে"। এবং তা "সর্বাধিক স্বেচ্ছাচারিতা ও সর্বনিম্ন স্বাধীনতা" সৃষ্টি করেছে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে অক্ষরধাম আক্রমণের মামলায় যে ছয়জনকে ট্রায়ালকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছিল তারা সবাই যে সুপ্রিমকোর্টে খালাস পেয়ে গেল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি নাগরিক অধিকারের "দুর্বল" অবস্থার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেন এবং বলেন যে "রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট রায় দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তাহীনতার" কথা বলেন। তাঁর এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়েও বলতে হবে যে যেসব এলাকায় সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে সেসব এলাকায় আবার নাগরিক অধিকারের 'দুর্বল' অবস্থার আর একটি বিশেষ মাত্রা আছে। সেখানে অপরাধ করলেও সরকারি সেনাবাহিনী ও কর্মকর্তাদের জন্য আছে আইনি রেহাই। জীবনের অধিকার ও নাগরিক অধিকার সেখানে বলা যায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সামরিক বিভাগের লোকেদের অপরাধের বিচার করার অধিকারই নেই অসামরিক ফৌজদারি আদালতগুলির। অপরাধের বিচারের হাত থেকে এই ধরনের মুক্তিই সেখানে সবার ওপরে। তাই যখন একটি দক্ষিণপন্থী হিন্দু দল, ভারতীয় জনতা পার্টি, নয়া দিল্লীর ক্ষমতায় আসে আর সমস্ত "বিশেষ" সুবিধা তুলে দেওয়ার জন্য অজ্ঞান হট্টগোল শুরু করে, তখন কিন্তু এদেশের যেখানে যেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে সেখানে যে কী "বিশেষ" সুবিধা আসলে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে কোনো কথা হয় না। যাঁরা "বিশেষ" সুবিধার বিরোধী, তাঁদের যদি সত্যিই বিশ্বাসের জোর থাকে তাঁরা প্রথমেই সেইসব বিশেষ সুবিধা তুলে দিতে বলবেন যেগুলি দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, এবং তাঁরা আইনের চোখে সমানাধিকারের সুরক্ষা পাচ্ছেন না।

'সংখ্যাগরিষ্ঠ' প্রেক্ষিত সহ বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ-র বিজয়ের ফলে সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের যারা শিকার তাদের জন্য ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কার কারণ আছে। 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' পার্টির এই বিজয়কে দেখা হবে কোনকিছুকেই ছাড় না দেওয়ার নীতির সমর্থন হিসাবে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কালক্ষেপের সমর্থন হিসাবে। যেমন, কাশ্মীর নিয়ে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা সবই কাশ্মীরের অ-মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে।[১] জম্মুর অ-মুসলিম, কাশ্মীরের পণ্ডিত ও লাদাখে বৌদ্ধদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এমনকি ভারতীয় টুরিস্টদের মঙ্গলচিন্তাও স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরে নিয়োজিত বিশাল পরিমাণ অ-মুসলিম সামরিক বাহিনীর হাতে মর্মান্তিকভাবে আক্রান্ত সেখানকার মুসলিমদের সম্বন্ধে এক হিরণ্ময় নীরবতা পালন করা হচ্ছে। গণধর্ষণ, গণহত্যা, ভুয়ো সংঘর্ষে মৃত্যু, তুলে নিয়ে গিয়ে হাপিস করে দেওয়া বা 'অজানা' মানুষদের গণকবরের বিষয়গুলিকে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না, যেন এগুলির কোনো গুরুত্বই নেই। উল্টো দিকে, অসামরিক নাগরিকদের তুলনায় সৈন্যরা রয়েছে একটা সুবিধাজনক অবস্থায়।

জাতি-রাষ্ট্রের ইতিহাস হতে পারে আত্মীকরণের এক রক্তাক্ত প্রক্রিয়া, নিষ্ঠুর ও অনমনীয় এক প্রক্রিয়া। 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' ৬৭ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে দেশের ভূখণ্ডকে অটুট রাখতে ও প্রতিষ্ঠিত 'ব্যবস্থা'-কে টিকিয়ে রাখতে এই দীর্ঘ সময় ধরে দেশের কোনো না কোনো জায়গায় রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এটা স্বীকার করা বিশেষ কঠিন হওয়া উচিত নয় যে এই ৬৭ বছরে কাশ্মীর, মণিপুর, নাগা এলাকায় সংঘর্ষের অবসান ঘটেনি, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা বা মিজোরামেও তা ঘটেছে। আর এখনও ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বনভূমি ও আদিবাসী এলাকায় যুদ্ধ আরও জোরদার হচ্ছে, আকাশপথে যুদ্ধ ও নিয়মিত সামরিক বাহিনী ব্যবহার শুরু হচ্ছে। তাহলে এই তো সময় সামরিক বাহিনী দিয়ে দমনের সমালোচনার, এই তো সময় যুদ্ধ করে যা দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে পেশীশক্তির বদলে গণতান্ত্রিক পথে গিয়ে তার সমাধানের চেষ্টার। সরকার যখন কোনো গণ আন্দোলন দমনের জন্য সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেওয়া মনস্থ করে তখন যুদ্ধ হয়, সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করে তখন হয় না। খোঁজ করলেই দেখা যাবে কাশ্মীর, মণিপুর, আসাম, নাগা এলাকায়, বা কেন্দ্রীয় ভারতের আদিবাসী ও বনাঞ্চলে সবসময়েই রাজনৈতিক দাবি দমনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্রগুলিতে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রবক্তা ও সমর্থক হলো সমাজের সোচ্চার অংশটি, আরও কিছু কণ্ঠ আছে যারা এইসব যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘর্ষের বিষয়টি, প্রতিপক্ষকে অপরাধী ও বেআইনি ঘোষণা করার বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চায়। সরকারি বক্তব্য পাশ-

কাটানো কথায় ভর্তি। জাতিরাষ্ট্রের ধারণাটি নিজেই উদারনীতির বিরোধী কারণ তাতে দাবি করা হয় যে দেশের মধ্যে কোনো বৌদ্ধিক বা রাজনৈতিক মতভেদ নেই। মতবিরোধ থাকলেই তাকে অপরাধমূলক চক্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে, 'বিদেশি হাত' তো আছেই, যাতে করে অবোধদের বোঝানো যায় যে রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী আছে সেখানকার জনগণকে 'রক্ষা' করার জন্য, তাদের উৎপীড়ন করার জন্য নয়। অসামরিক মানুষরা ক্ষতবিক্ষতও হয়ে গেলেও 'জাতীয় স্বার্থে' সেটা যেন ঠিক কাজ, কারণ এর দ্বারা তারা নিজেদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এটা তাই আশ্চর্যের কিছু নয় যে এক প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী কৃত অপরাধকে সামান্য 'অসুবিধা' আখ্যা দেন। অন্যরা মানবাধিকার ভঙ্গকে একেবারেই মানা হবে না বলেন, কিন্তু তার পরই আরও বেশি বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটতে থাকে। এক রাজ্যপাল প্রকাশ্যভাবে একজন মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা করেন কারণ তিনি নাকি মুসলিম অনুপ্রবেশকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এক লেফটন্যান্ট জেনারেল, নর্দার্ন কম্যান্ডের প্রধান, তিনি বলেন যে কাশ্মীরের রাস্তায় যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় সেগুলোই নাকি এক ধরনের 'বিক্ষোভ সন্ত্রাসবাদ'। কথা হলো, আপনি যে অবস্থানই নিন না, উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যে তার নিজের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, বিরোধীদের অপরাধী আখ্যা দিচ্ছে, গণতান্ত্রিক সমাধানের কথা ভাবছেই না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সামরিক বাহিনীর কোপে পড়েছে যারা তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে— একে প্রশ্ন না করে উপায় নেই।[২]

যুদ্ধ ও ন্যায়বিচার

যুদ্ধ কী? ক্লাউজভিৎজ বলেছেন, যুদ্ধ হলো আমাদের শত্রু যাতে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলে, তার জন্য বলপ্রয়োগ। এই চিন্তার একটি রূপ আমরা দেখতে পাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অ-প্রথাগত যুদ্ধের মতবাদে (২০০৬)। সেখানে উদ্দেশ্য হলো জনগণের "ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন"। শুধু সশস্ত্র শত্রু নয়, এমনকি নিরস্ত্র মানুষ যারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করছে তাদের সম্পর্কেও এটি প্রযোজ্য। বিদ্রোহ দমন যেহেতু জনগণের মাঝে যুদ্ধ, সেখানে 'জনগণের ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা' একটা বর্বরতা। এইসব যুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণধর্ষণ, গণহত্যা, মানুষকে উধাও করে দেওয়া, বন্দিদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার (পায়ুকাম সহ), পুরস্কার বা পদোন্নতির জন্য হত্যা ও দলত্যাগীদের ব্যবহার করে গোপন অপারেশন (যাতে পরে তা অস্বীকার করা যায়) চালানো হয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং জম্মু-কাশ্মীরে এমন উদাহরণ খুব কম যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর লোকরা 'কর্তব্যরত অবস্থায়' এধরনের কাজ করার জন্য শাস্তি পেয়েছেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা তুলনায় সোজা, কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া এবং তাদের যারা নির্দেশ দিয়েছে তাদের অপরাধ নির্ণয় করাটা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

জম্মু-কাশ্মীরের ২২টি জেলা থেকে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৯০ প্রত্যাহার নিয়ে যখন বিশাল বিতর্ক হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল, এটা ধীরে ধীরে সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়ার অংশ। এই বিশ্বাসের সঙ্গে তাল রেখেই ২০১১ সালের ২১ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে "কয়েকদিনের মধ্যে" চারটি জেলা থেকে *আফস্পা* ও উপদ্রুত অঞ্চল আইন প্রত্যাহার করা হবে। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে, মন্ত্রীসভা যখনই রাজ্যপালকে উপদেশ দেবে এই আইনগুলি তুলে নিতে, তিনি তা করতে বাধ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের মত অন্যরকম। তারা বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপালের ক্ষমতা আছে এসব ব্যাপারে মন্ত্রীসভার উপদেশ না মানার। আফস্পা ও উপদ্রুত এলাকা আইন রাখবেন কী রাখবেন না সে ব্যাপারে নিজের বিচার প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে সে রাজ্যের রাজ্যপালের। অন্যভাবে বললে, এটা হলো জনসমক্ষে একটা বানানো বিতর্ক তোলা যাতে করে জম্মু-কাশ্মীর থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিটাকে ধীরে ধীরে *আফস্পা* তোলার দাবিতে পর্যবসিত করা যায়। কিন্তু *আফস্পা* তোলার এই বুকনিও ছিল ভুয়ো। বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তো জোর দিয়ে বলছেন যে "নিরাপত্তার অবস্থা *আফস্পা* প্রত্যাহারের অনুকূল নয়।"

আগেকার ঔপনিবেশিক আইনের (১৯৪২) ওপর ভিত্তি করে তৈরি *আফস্পা* বড়জোর এক পাতা জোড়া একটি আইন, কিন্তু ছোট হলেও তা কম মারাত্মক নয়। *আফস্পা*-র ৪ নং (জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৫ নং) ধারায় সেনাবাহিনীকে গুলি চালিয়ে হত্যা করার পর্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, আর কোথাও পাঁচ জনের বেশি জড়ো হলেই তারা যদি শান্তি ভঙ্গ করে বা সশস্ত্র হয় (এমনকি চিরাচরিত ধরনের অস্ত্র হলেও) সেটা হবে বেআইনি জমায়েত। অপরাধ করেছে বা অপরাধ করতে চলেছে এই সন্দেহের ভিত্তিতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীকে। কোনো ভবন থেকে আক্রমণ হয়েছে বা আক্রমণ হতে পারে সন্দেহে ঘরবাড়ি সহ যে কোনো ভবন ধ্বংসের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেনাবাহিনীকে। কোনো লোককে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে সন্দেহে বা কোনো চোরাই মাল বা অস্ত্র আছে সন্দেহে তারা যে কোনো জায়গায় ঢুকে তল্লাসি চালাতে পারে ওয়ারেন্ট ছাড়াই। *আফস্পা*-র ৬ নং (জম্মু-কাশ্মীরে ৭নং) ধারায় এই আইনের আওতায় কাজ করা সেনাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া বিচার করা যাবে না।

ইউপিএ সরকারের আগে সুপ্রিম কোর্ট এই আইনের একটা পুনর্বিবেচনা করেছিল। ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট *আফস্পা*-র

সাংবিধানিক বৈধতা তুলে ধরে বলেন যে সংসদের এইরকম আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। এর বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা আইনটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এই বলে যে তা জীবন, সমানাধিকার, বাক স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হওয়ার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, কোনো পেশায় কাজ করার অধিকার, এবং অকারণে গ্রেপ্তারি থেকে সুরক্ষার মতো মৌলিক অধিকারের বিরোধী। ১৯৮২ সালে পেশ করা এই আবেদনের শুনানি হয় ১৫ বছর পর ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে। আর সে বছরের নভেম্বরে রায় বেরিয়ে যায়। এই রায়ের সিংহভাগ জুড়ে আছে সংসদের এই ধরনের আইন প্রণয়নের অধিকার আছে কিনা আর এই ধরনের আইন প্রণয়ন ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে যায় কিনা তা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা। কিন্তু *আফস্পা* কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি এই রায়ে।

২০০৪-৫ সালে বিচারপতি জীবন রেড্ডি কমিটি এই আইনের একটি মূল্যায়ন করার দায়িত্ব নেন। কমিটিকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা অনুযায়ী *আফস্পা* যেসব এলাকায় লাগু হয়েছে সেখানকার মানুষের অভিজ্ঞতা বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু তিনি কাজ করেন শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, জম্মু-কাশ্মীরে জনশুনানি করতে তিনি রাজি হন নি। এর ফলে এর বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। মূল্যায়ন ও গণশুনানি হয়েছিল শুধু মণিপুর ও আসামে। এর রিপোর্টে *আফস্পা* প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়, যদিও এই সুপারিশ করার ব্যাপারটা কমিটির কাজের পরিধির মধ্যে ছিল না। যাই হোক, এই কমিশন প্রস্তাব দেয় যে *আফস্পা*-র ধারাগুলি ইউএপিএ-র (আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট ১৯৬৭) মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হোক। অর্থাৎ সমস্যার সমাধানের বদলে কমিশনের প্রস্তাব ছিল সেটা ধামাচাপা দেওয়ার। এভাবে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৭ সালের রায় ও বিচারপতি রেড্ডি কমিটির রিপোর্টে 'উপদ্রুত' যেসব জায়গায় রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে সেখানে তাদের আরও ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টিকে সমর্থন যোগানো হলো।

যুদ্ধের নিয়ম কানুন

সাধারণভাবে ভারতে যেসব আইন রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীদের আইনি সুরক্ষা দেয় আর একই সঙ্গে নাগরিকদের আইনি অধিকার খর্ব করে, সেগুলি কার্যকর হয় দেশের মধ্যে বা বাইরে যুদ্ধের সময়। এই বাহিনীকে বহুস্তরীয় আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়, *আফস্পা* তাদের একটি। যেমন যেখানে সশস্ত্র বাহিনী 'সরাসরি কাজে লিপ্ত' নয়, যেমন যখন তারা 'শান্তিপূর্ণ জায়গায়' আছে, তখন কোনো সেনা যদি কোনো অসামরিক নাগরিককে খুন, হত্যা বা ধর্ষণের অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তার বিচার হবে বেসামরিক ফৌজদারি আদালতে। আরও এগোনোর আগে বলে নেওয়া দরকার যে বিদ্রোহীদের বেআইনিকরণ বা তাদের অপরাধী আখ্যা দেওয়া হয় কারণ জাতি-রাষ্ট্র তাদের স্বীকার করতে চায় না। এর অর্থ, বিদ্রোহী বা জঙ্গিদের হত্যা করা যেতে পারে, তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো যেতে পারে, সমস্ত নিষ্ঠুর আইনের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যেতে পারে তাদের ওপর। সরকারি সেনাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। ভি জি রাও রায়ে (১৯৫০, প্যারা ৮৩) ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে আইনের শাসনের একটি মৌলিক নীতি হলো, "আইনের শাসন বলতে বোঝাচ্ছি যে, কোনো সরকারি অফিসার যদি ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার করে বা অন্য কোনো অন্যায় করে সেক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক সেই অন্যায় করলে যেভাবে তার বিচার হতো, সরকারি অফিসারকেও সেই একই ভাবে আদালতের বিচারাধীন হতে হবে। আইনের চোখে সমানাধিকারের নীতিটি যেন বিশেষ কোনো গোষ্ঠী, যেমন সৈন্য, ডাক্তার বা আইনজীবীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত কোনো বিশেষ আইন দ্বারা লঙ্ঘিত না হয়। এরকম কোনো আইন হয়ত অন্যদের ক্ষতি করবে না, শুধু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে। কিন্তু এইসব আইন প্রয়োগ আর সাধারণ আইন প্রয়োগের সময় দেখতে হবে মানুষে-মানুষে যেন কোনও ফারাক না করা হয়।"

সামরিক আইনের ৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে "অসামরিক অপরাধ"-এর ক্ষেত্রে "আদালতে বিচার হবে"। ৭০ নং ধারায়ও একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে "অসামরিক অপরাধের" একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে, যেগুলির ক্ষেত্রে কোর্ট মার্শাল হবে না। তবে আইনে এও বলা আছে যে যদি "কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুন বা শাস্তিযোগ্য নরহত্যা বা ধর্ষণের মত অপরাধ সংগঠিত হয়, যা স্থলসেনা, নৌসেনা বা বায়ুসেনা আইনের অন্তর্গত নয়, তবে তা এই আইনে অপরাধ বলে গণ্য হবে না, এবং কোর্ট মার্শাল করে বিচার হবে না, যদি না এরকম কোনো অপরাধ (ক) সক্রিয় কাজের সময় (খ) ভারতের বাইরে বা (গ) সীমান্ত চৌকিতে সংঘটিত হয়"। এই 'সক্রিয় কাজে' (active service) লিপ্ত থাকার ব্যতিক্রমটি লাগু করা যায় যখন দেশের শত্রুদের [অর্থাৎ "সব সশস্ত্র বিদ্রোহী, সশস্ত্র রাজদ্রোহী, সশস্ত্র দাঙ্গাবাজ এবং যে কোনো সশস্ত্র ব্যক্তি, যার বিরুদ্ধে মিলিটারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া যায়" (সামরিক আইনের ৩(১০) উপধারা)] সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টি ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যায়।[৩]

উপদ্রুত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটগুলিই স্থির করে যে কোনো কেসের বিচার মিলিটারি কোর্ট করবে (অর্থাৎ স্থল সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে কোর্ট মার্শাল এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে সাধারণ সুরক্ষা বাহিনী আদালত) না কি ফৌজদারি আদালতকে বিচার করতে দেওয়া হবে। তবে যেখানেই বিচার হোক না কেন, সেনাবাহিনীর সদস্যরা এমন

একটি আইনি বর্ম পরে থাকেন যে তাদের শাস্তি দেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি পথচলা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ে।

যখন কোনো অপরাধের অপরাধীদের একজন সেনা এবং আর একজন ধরা যাক বিশেষ পুলিশ অফিসার, তখন বিশেষ পুলিশ অফিসারটির বিচার হয় ফৌজদারি আদালতে অথচ সেনাটির হয় কোর্ট মার্শাল। ১৪ই আগস্ট, ২০০০ সালে বানিহালের নওগাঁ গ্রামে সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন ও এক বিশেষ পুলিশ অফিসার দুজন মহিলাকে ধর্ষণ করে (কেস নং ৪২)। কেসটি দু'ভাগ হয়ে ক্যাপ্টেনের কোর্ট মার্শাল হয় এবং বিশেষ পুলিশ অফিসারটির ফৌজদারি আদালতে বিচার হয়। বলে নেওয়া দরকার যে কোর্ট মার্শালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। ক্যাপ্টেনটি কোর্ট মার্শালে দোষী সাব্যস্ত হলেও হাইকোর্ট তাকে রেহাই দেয়। আইনজীবীর মাধ্যমে হাইকোর্টে জমা দেওয়া কাগজে ক্যাপ্টেন দাবি করে যে পারস্পরিক সম্মতিতে সে একজন মহিলার সঙ্গে সহবাস করেছিল। ঘটনা হল, একটি 'উপদ্রুত' এলাকায় মিলিটারির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আর অসামরিক জনগণ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। সশস্ত্র সেনা এবং নিরস্ত্র নাগরিকদের মধ্যে এক অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক তৈরি হয়। 'সম্মতি'র প্রশ্নে ধরা নেওয়া হয় যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘর্ষ নেই এবং এক সশস্ত্র সেনা ও এক নিরস্ত্র মহিলার মধ্যে অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক নেই। তাই যখন একজন অভিযুক্ত ধর্ষণের বদলে পারস্পরিক-সম্মতিতে সহবাস দাবি করতে পারে এবং ফৌজদারি আদালতে বিচার না-হওয়ারও দাবি করতে পারে, তখন একথাই প্রমাণ হয় যে যখন সেনাবাহিনীর এরকম রেহাই এবং সরকার কর্তৃক নিজদেশে যুদ্ধাবস্থা অস্বীকার এক চূড়ান্ত পরস্পরবিরোধী অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।[৪]

যখন বেশ কিছু এমন অপরাধ অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ চলাকালে ঘটতে থাকে, যার সংজ্ঞা ভারতীয় আইনে বিবৃত নয়, তখন অবস্থা আরও ঘোরালো হয়। তাই ভারতীয় আইনে কাউকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাপিশ করে দেওয়া, অত্যাচার করা, বা গণহত্যার কোনো সংজ্ঞা নেই, আর এই আইন জানেও না যে কীভাবে এমনকি ধর্ষণ বা অত্যাচার সশস্ত্র সংঘর্ষের এলাকায় প্রবলভাবে বেড়ে যায় এবং ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধ বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে পর্যবসিত হয়। সশস্ত্র সংঘর্ষ এলাকায় এমনকি বাড়িতে ঢুকে তল্লাসি করাও তীব্র রূপ নেয় কারণ এই সুযোগে যৌন অপরাধ বা বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। কেননা বাড়ির পুরুষদের মহিলা ও বাচ্চাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে অবধারিতভাবে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গুলি করে খতম করা, অসামরিক ব্যক্তিদের গুলি করে খতম করলে পুরস্কার দেওয়া, আটক রাখা, পুরুষদের অবমাননার জন্য ব্যাপক হারে অত্যাচার করা এবং লোকদের উধাও করে দেওয়া— এ সবই খুব সাধারণ ঘটনা। এসবের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সুরক্ষা থাকা, সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির প্রবল ঔদ্ধত্য এবং প্রাথমিক আইনের শাসনের সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব যুদ্ধেরই এক প্রকট লক্ষণ। তাই পাথ্রিবাল মামলাটি পর্যালোচনা করা ভীষণ জরুরি যাতে বোঝা যায় কীভাবে ন্যায়বিচারের রাস্তা এইসব যুদ্ধাপরাধে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ।

একটি মামলা

পাথ্রিবাল কেসটিই সবচেয়ে বেশিদূর গেছে। এই কেসটি দেখিয়ে দিয়েছে যে অসামরিক লোকেরা নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের বিরুদ্ধে নিজেই অভিযোগ দায়ের করতে পারেন, পুলিশ ব্যাপারটির তদন্ত করে চার্জশিটও ফাইল করতে পারে, কিন্তু শাস্তির ব্যাপারটা ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে। সত্যি বলতে কী, অভিযোগ দায়ের করার মতো সাধারণ ব্যাপারও সংঘর্ষ এলাকায় ভীষণ কঠিন। পুলিশ তদন্ত হওয়াটা বিরল ঘটনা। অন্যভাবে বললে, পাথ্রিবাল কেসে যখন এই সব ধাপ অতিক্রম করা গেল, দেখা গেল যে ন্যায়বিচারের চাকা এমনকি ১৪ বছরেও বেশিদূর এগোতে পারল না।

২০০০ সালের ২০ মার্চ। অনন্তনাগ জেলার ছত্তিসিংপোরায় 'অজ্ঞাত বন্দুকধারী'র হাতে ৩৬ জন শিখ নিহত হন। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ভারত সফরে এসেছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ঘটনাটির জন্য লস্কর-ই-তৈবা-কে দায়ী করে, কিন্তু সরকারি জঙ্গিদের দিকেও আঙ্গুল তোলে অনেকে।[৫] কাশ্মীরের আরও অনেক ঘটনার মতো এই ঘটনাটিরও এখনো পর্যন্ত মীমাংসা হয় নি, দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে নি। ২৩-২৪ মার্চ সামরিক বাহিনী আশপাশের গ্রামগুলি থেকে ১৭ জন অসামরিক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায় ঐ শিখদের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার নামে। অভিযোগ যে ২৫ মার্চ পাথ্রিবাল থানার তিনটি গ্রাম থেকে আরও পাঁচ জনকে ভোরবেলায় সামরিক বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে সংঘর্ষের নামে হত্যা করা হয়। সামরিক বাহিনী যে এফআইআর দায়ের করে তাতে বলা হয় যে ছত্তিশসিংপোরায় শিখদের হত্যাকারী পাঁচজন 'বিদেশি জঙ্গি'-কে তারা মেরেছে। সামরিক বাহিনী দাবি করে যে ঐ পাঁচ জনের মধ্যে তিন জন পাকিস্তানি— তাদের নামের তালিকাও দাখিল করা হয়। ৩ এপ্রিল মানুষ যখন দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নামেন, পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের ওপর সিআরপিএফ ও এসওজি গুলি চালায়, আট জন নিহত হন।

রক্তঝরা প্রতিবাদ মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বাধ্য করে ডেপুটি এসপি-র নেতৃত্ব একটি তদন্ত করতে। তদন্তের রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয় যে নিহতরা স্থানীয় অসামরিক ব্যক্তি, 'বিদেশি জঙ্গি' নন। এবং ব্যাপারটা ছিল সাজানো সংঘর্ষের ঘটনা। তখন গ্রামের মানুষের অভিযোগ গ্রহণ করা হলো। ২০০২ সালের মার্চ মাসে দেখা গেল যে শ্রীনগরের সরকারি

মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজি বিভাগের প্রধানের সঙ্গে যোগসাজসে ডিএনএ নমুনায় কারচুপি করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে দেখা গেল, নিহত পাঁচ জন 'বিদেশি' নন, জঙ্গি তো ননই। যে ১৭ জন সামরিক বাহিনী তুলে আনার পর নিখোঁজ হয়েছিল এরা তাদের পাঁচজন। নভেম্বর মাসে বিচারপতি জি এ কুচে কমিটি গঠন করা হলো সম্পূর্ণ ঘটনাটির বিষয়ে তদন্তের জন্য। ডিসেম্বরে কমিটি রিপোর্ট দিলে ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে এই ঘটনার তদন্তভার নিতে বলে। তিন বছর পর, সিবিআই চার্জশিট দাখিল করে। তাতে বলা হয়, ''ঘটনার তথ্যাবলী ও ঘটনাক্রম থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে এই পাঁচজন নির্দোষ অসামরিক ব্যক্তিকে ৭আরআর-এর লোকেরা তুলে নিয়ে যায়... এবং ভুয়ো সংঘর্ষে তাদের হত্যা করা হয়...''। সামরিক বাহিনীর পাঁচজনকে সিবিআই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি (অপরাধমূলক চক্রান্ত) ধারায় অভিযুক্ত করে— সাথে ছিল ৩৪২ ধারা (অন্যায়ভাবে আটক রাখা), ৩৬৪ ধারা (হত্যার জন্য অপহরণ), ৩০২ ধারা (হত্যা) এবং ২০১ ধারা (প্রমাণ লোপাট বা অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য ভুল তথ্য দেওয়া)।

২০০৬ সালে সামরিক বাহিনী সর্বোচ্চ আদালতে যায়। তাদের দাবি এই যে সামরিক বাহিনীর লোকের বিচার করার অধিকার ফৌজদারি আদালতের নেই। ছ বছর পর, ২০১২ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চ রায় দেন। এমনকি তদন্ত করতে হলেও অনুমতি নিতে হবে, সামরিক বাহিনীর এই দাবি বাতিল করে দিলেও সুপ্রিম কোর্ট সামরিক বাহিনীর এই দাবি মেনে নেয় যে চার্জশিট দাখিলের পর বিচারের কাজ শুরু করতে হলে অনুমতি লাগবে। সুপ্রিম কোর্ট এও বলেন যে সেনা আইনের ৩৪২ ধারা যদিও ফৌজদারি আদালতকে সামরিক বাহিনীর লোকদের বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া বিচার শুরু করা যাবে না। ফলে, সামরিক বাহিনীর লোকেদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিচারে বিচারযোগ্য কোনো কেস আছে কিনা তা স্থির করার ক্ষমতা নেই ম্যাজিস্ট্রেটের। সুপ্রিম কোর্ট এটাও বলেন যে সেনা আইনের ১২৫ ধারা অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর লোকদের বিচার ফৌজদারি আদালতে হবে নাকি কোর্ট মার্শাল হবে, সামরিক বাহিনীই সেটা স্থির করবে। কোর্ট মার্শালের জন্য কোনো অনুমতি লাগে না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর ২০১২ সালে সামরিক বাহিনী এই কেসে কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্ত নেয়।

২০১৪ সালের ১৪ মার্চ জম্মু-স্থিত ১৬ কর্পস-এর ব্রিগেডিয়ার অ্যাডজুভ্যান্ট শ্রীনগরের প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি ১১ পৃষ্ঠার জবাব দাখিল করেন। ২০০০ সালের ২৪-২৫ মার্চ পাথ্রিবাল হত্যায় বিক্ষুব্ধ পক্ষের একজনকে জেনারেল মিলিটারি কোর্টের প্রত্যয়িত নকল দিতে কেন অস্বীকার করা হয় তার জবাবে সামরিক বাহিনীর বক্তব্য, আবেদনকারী সাতজন নিহতের একজন জাহুর আহমদ দালাল-এর কাকা নাজির আহমদ দালাল ও তার পরিবারের ''সামরিক বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসার (১৬ কর্পস-এর) করা তদন্তের নকল নেওয়ার কোনো অধিকার নেই, কারণ তিনি ঐ ঘটনায় সংযুক্ত নন''। সামরিক বাহিনী জানায় যে তারা ঘটনাটির ''কার্যকর তদন্ত'' করেছে। সেটা কীরকম? উক্ত কম্যান্ডিং অফিসার অভিযুক্ত পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনলেন, এবং ''আদেশ দিলেন যে প্রমাণগুলি লেখা হোক'', যাকে বলা হয় ''সামারি অফ এভিডেন্স''। তাতে ''বাদিপক্ষের ৫৫ জন সাক্ষী যাদের জেরা করা হয়েছিল, যার মধ্যে আছে পাঁচজন নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, ঘটনাটিতে যুক্ত পুলিশদের, তদন্তকারী সিবিআই আধিকারিক ও সেনাবাহিনীর সাক্ষীদের'' বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হলো। ''বিশাল পরিমাণ নথিপত্র যাতে ঘটনার পর যেসব রিপোর্ট হয়েছে, ফরেনসিক রিপোর্ট, পুলিশি নথিপত্র, সিবিআই তদন্তকালে সাক্ষীদের জবানবন্দি, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সরকারের তদন্ত কমিশনগুলির তদন্ত রিপোর্ট, এগুলি সব সামারি অফ এভিডেন্সে নথিভুক্ত করা হলো।'' এই সামারি অফ এভিডেন্সের নকলই চেয়েছিলেন আবেদনকারী।

ঐ চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে এই সামারি অফ এভিডেন্সের ভিত্তিতেই কম্যান্ডিং অফিসার ''নিশ্চিত হয়েছেন যে ২৫ মার্চ, ২০০০ সামরিক বাহিনী... ও অসামরিক পুলিশের একটি যৌথ অভিযান হয়েছিল''। এতে আরও বলা হয়েছে যে ''কোনো নথিতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যাতে ঐ পাঁচজন অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে নিহত পাঁচজনের অপহরণ/নিখোঁজ করে দেওয়ার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায়।'' আর ''নথিপত্রে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি যাতে পাঁচজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কোনো মামলা দাঁড় করানো যায়।''

অর্থ উদ্ধার

এই ''কার্যকর তদন্ত'' যে কীরকম অস্বচ্ছ তা বিশদে বলার প্রয়োজন নেই। এটি হয়েছে আইন মেনে, সর্বোচ্চ আদালতের ১৯৮৭ সালের রায় (ভারত সরকার বনাম মেজর এস কে শর্মা) অনুসারে। কিন্তু তাতে এই সামরিক বিচার সামরিক বাহিনীর লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত বিক্ষুব্ধ অসামরিক মানুষদের কাছে স্বচ্ছ বা নিরপেক্ষ হয়ে যায় না। সামারি অফ এভিডেন্সের মতো সাধারণ একটা জিনিসও যদি নিহতের পরিবারের লোকেদের না দেওয়া হয়, তার মানে এই ''কার্যকর তদন্তের'' লিখিত নথি পাওয়ার জন্য আবার এক বিশাল লড়াই করতে হবে, যাতে করে সামরিক বিচারব্যবস্থার ভুলভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা যায়, অপরাধীদের আবার বিচার করা যায়। এর জন্য বছরের পর বছর ধরে আপিল, শুনানি করে যেতে হবে, আর ফলাফল অনিশ্চিত। দেখা যাচ্ছে, পাল্লাটা সেনাবাহিনীর লোকেদের দিকে অস্বাভাবিকভাবে হেলে আছে।

সিবিআই যখন পাথ্রিবাল কেসটির তদন্ত করছিল, তখন

সেই তদন্তে সামরিক বাহিনী অনেক বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তারা চার্জশিট দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক আদালতে বিচারের সময় তাদের কিছু বলার অধিকার নেই। সিবিআই-এর চার্জশিটে ''কোনো প্রমাণ'' দেওয়া হয়নি বলে সেটিকে নাকচ করে দেওয়া তাই সামরিক বাহিনীর পক্ষে সহজ হয়েছে। সামরিক বাহিনীর বক্তব্য ছিল, এটি পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর যৌথ অভিযান, আর পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়, সামরিক বাহিনীর লোকেরা যখন শুধু গোপন তথ্য অনুসারে যৌথ অভিযান চালাচ্ছে তখন তারা কেন অপহরণ করবে, খুন করবে, মৃতদেহ বিকৃত করবে?[৬]

সিবিআই দেখেছিল যে সামরিক বাহিনীর নিজের নথিপত্রই দেখাচ্ছে যে এটি ছিল সামরিক বাহিনীর অভিযান, রাজ্য পুলিশ সঙ্গে ছিল, কিন্তু তারা কাজ করছিল না। সিবিআই-এর দাবি, বাজেয়াপ্তি তালিকা, পরিস্থিতির বিবরণ, সংঘর্ষ পরবর্তী প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে এবং ৭-আরআর ও অসামরিক পুলিশের মধ্যেকার চিঠিপত্রে দেখা গেছে যে যৌথ অভিযান হোক আর না হোক, তার নেতৃত্বে ছিল সামরিক বাহিনী। সামরিক বাহিনী বলেছে, পুলিশি সূত্রে পাওয়া গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান হয়েছে, পুলিশ কিন্তু সে কথা মানছে না। নথিপত্র থেকে বরং দেখা যাচ্ছে যে অপহরণে সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিরা জড়িত ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সকলেই সে কথাই বলছেন। সামরিক বাহিনীর নিজেরও সংবাদ ছিল যা সংগৃহীত হয়েছিল একজন 'সন্দেহভাজন'-এর কাছ থেকে, যে পাঞ্চালাথান এলাকার কিছু 'সম্ভাব্য' জায়গায় জঙ্গি বা জঙ্গিদের হয়ে কাজ করে এমন ব্যক্তিদের একটা তালিকা দিয়েছিল। কিন্তু সিবিআই-এর দাবি, সেই তালিকাতেও নিহত ঐ পাঁচজনের নাম ছিল না। ফলে ঐ পাঁচজন অসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ভিত্তি পরিষ্কার নয়। চার্জশিটে এটাও নথিভুক্ত করা হয়েছে যে ঐ পাঁচজনের দেহে বুলেটের ক্ষত ছাড়াও দেহের ৯৮ শতাংশ পোড়া ছিল। কিন্তু যে 'কোঠা'-তে তারা লুকিয়ে ছিল বলে বলা হয়েছে, সেখানে পোড়ার চিহ্ন ছিল অকিঞ্চিৎকর। অর্থাৎ এই পাঁচজনকে মারার পর পোড়ানো হয়েছে— কোনো বিস্ফোরক থেকে পোড়া নয়, বা কেউ কোঠায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে পোড়া নয়। সত্যি বলতে কি, নিহত 'জঙ্গিদের' কাছ থেকে যেসব অস্ত্র 'আটক' করা হয়েছে সেগুলোও পোড়া নয়। এসব থেকে সিবিআই মনে করে যে প্রমাণ ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষ করে নিহতদের যাতে চিহ্নিত করা না যায় তার চেষ্টা হয়েছে। সিবিআই এও অভিযোগ করেছে যে নিহতরা সবাই স্থানীয় গ্রামবাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনজনকে পাকিস্তানি বলে দাবি করা হয়েছে, তাদের ভুয়ো নাম দেওয়া হয়েছে। নিহতদের কেন ভুয়ো নাম ভুয়ো পরিচয় দেওয়া হলো? আর ওরা যদি স্থানীয় জঙ্গিই হবে তাহলে তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে সেসব অস্ত্র সামরিক বাহিনী কোথা থেকে পেল? সিবিআই যেসব তথ্যপ্রমাণ দিয়েছে তা থেকে দেখা যায় এই অপরাধে সামরিক বাহিনীর অভিযুক্তদের জড়িত থাকার বিষয়ে যথেষ্ট প্রাথমিক প্রমাণ আছে। সুতরাং 'কোনও প্রমাণ নেই' এই দাবি ধোপে টেকে না। শুধু তাই নয়, সফল সংঘর্ষের জন্য সামরিক বাহিনীর ঐ পাঁচ অভিযুক্তকে প্রশংসা করা হয়েছে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাহলে সামরিক বাহিনী সংঘর্ষের কথা স্বীকার করছে কিন্তু কীভাবে তা হয়েছিল সেটা স্বীকার করছে না কেন?

সিবিআই-এর দেওয়া তথ্যের বাইরে আর কিছু তথ্য যদি সামরিক বাহিনীর কাছে থাকে তা আমরা জানতে পারব না। কারণ ভারত সরকার বনাম মেজর এ হোসেন মামলা (১৯৯৭)। মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে ''২২৬ নং ধারা অনুসারে কোর্ট মার্শালের পদ্ধতি যদিও হাইকোর্টের রিভিউয়ের আওতায় আসে, ২২৭ নং ধারা অনুসারে কোর্ট মার্শাল হাইকোর্টের দেখভালের আওতায় আসে না। কোর্ট মার্শাল যদি ঠিক পদ্ধতিতে, ঠিক ঠিক লোককে নিয়ে করা হয় তবে হাইকোর্ট বা কোনও কোর্টেরই তার কথার ওপর কথা বলা চলে না।''

এভাবে ১৪ বছর পর, দীর্ঘ ও কঠিন আইনি লড়াই লড়ার পরও (এখনও চলছে) ভুয়ো সংঘর্ষে যাদের পরিবারে লোক নিহত হলো তারা ন্যায়বিচার পেল না।

অক্ষম বিচারব্যবস্থা আর বিচার থেকে রেহাইয়ের প্রশ্ন

১৯৯৭ সালের সর্বোচ্চ আদালতের রায় যেখানে *আফস্পা*-র সাংবিধানিক বৈধতা স্বীকার করে নিল, কিংবা মাসুদা পারভিন রায় (যেখানে হেফাজতে ভয়ানক অত্যাচার ও হত্যায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রীকে ৫০ হাজার টাকা এক্সগ্রাসিয়া দেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ তাতে নাকি সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যাবে), কিংবা যেসব মামলায় সর্বোচ্চ আদালত স্বীকার করে নিয়েছে যে অন্যায়ভাবে অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে কিন্তু তার শিকারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বেশি কিছু করে নি, সেসবের পাশাপাশি যদি পাথ্রিবাল মামলার রায় পড়া হয়, তা থেকে দেখা যাবে এইসব বিচার বা রায়গুলি কীভাবে এদেশের সামরিক বাহিনীর জন্য আইনি বর্মের আর একটি স্তর তৈরি করছে।

সেনা আইনের ১২৫ ও ১২৬ ধারা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী কোর্ট মার্শালের আগেই তার নিজের লোকদের বিচার করতে পারে। তার জন্য কোনো অনুমতি লাগে না। কিন্তু ১২৬ ধারা অনুসারে ফৌজদারি কোর্ট যদি নিজেরা বিচার করতে চায়, সেখানে সামরিক বাহিনী বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে। বিচার কোথায় হবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মতই চূড়ান্ত। অন্যভাবে বললে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়মমতো এ বিষয়ে চূড়ান্ত মতদানের অধিকারী, আসলে কিন্তু সামরিক বাহিনীর কথামতোই সব চলে।

ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাইকোর্ট ও তারপর সুপ্রিম কোর্টে যে সব আইনি প্রক্রিয়া চললো তা থেকে বিচার হলো না। শাস্তি প্রায় কিছুই হলো না। এই ধরনের দীর্ঘসূত্রিতা বিক্ষুব্ধদের ক্লান্ত করে, আইনি লড়াই থেকে তাদের সরিয়ে দেয়।

'অফিশিয়াল ডিউটি' নিয়ে আলোচনার সময় সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন, ''ঘটনা ও অফিশিয়াল ডিউটির মধ্যে একটা সাযুজ্য থাকতে হবে। এতে কিছু যায় আসে না যদি কাজটা ডিউটির পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় না হয়, কারণ সে প্রশ্নটা উঠবে পরে, যখন বিচার শুরু হবে।'' ''সামরিক বাহিনী যদি অত্যধিক শক্তি ব্যবহার করেও থাকে সে ব্যাপারটা শুনানি শুরু হওয়ার স্তরে দেখা যেতে পারে''- এ কথা বলে আদালত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এড়িয়ে গেল। প্রথমত, সামরিক বাহিনী কৃত অপরাধ খুব কমই শুনানির স্তরে আসে। শুনানির স্তরে পৌঁছানোর আগে অনেক বাধা পেরোতে হয়। সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অসামরিক ব্যক্তিদের অভিযোগ নিতে পুলিশকে রাজি করাটাই ভীষণ কঠিন। অভিযোগ দায়ের করা গেলেও খুব কমসময়ই তার তদন্ত ভালোভাবে শুরু করা যায়। তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক সামরিক বাহিনীর লোকদের জেরা করাটাই যেমন বিবাদ সৃষ্টি করে, সামরিক বাহিনী বেসামরিক পুলিসের হাতে নিজেদের লোকদের তুলে দিতে চায় না। তদন্তের ফলে যদি চার্জশিট দেওয়া হয়, শুনানি শুরুর আগেই অধিকার ও অনুমতির প্রশ্ন উঠে যায়।

দ্বিতীয়ত, সেনা আইনের ১২৫ ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বা বাহিনীর কম্যান্ডার ঠিক করতে পারেন কোর্ট মার্শাল হবে না ফৌজদারি কোর্টে বিচার হবে। কিন্তু কথা হলো, ব্যাপারটা আদৌ কোর্ট মার্শাল বা অ-ফলদায়ী বিচার পদ্ধতির স্তরে আদৌ নিয়ে যাওয়া হবে কিনা, হলে তা কীভাবে হবে সেটা আমরা কখনোই জানতে পারব না। পাথ্রিবাল কেস দেখিয়ে দিল যে এধরনের প্রক্রিয়ায় কী ঘটল তা জানাটাই কতটা কঠিন। আর তৃতীয়ত, সামরিক বাহিনী নিজেই বললো, তাদের কাছে নিহতদের একজন, নাজির আহমদ দালাল-এর পরিবারের লোকদের কোনো স্বীকৃতিই নেই। ফলে বিক্ষুব্ধদের আইনি অধিকার ও আক্রমণের শিকার মানুষদের ন্যায়বিচারকে পাত্তা না দেওয়াটা আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর আইন ও বিচারব্যবস্থার রায়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এখানেই 'গুড ফেথ' আর 'কর্মরত অবস্থায়' থাকার সময় নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

'সদুদ্দেশ্য' ('গুড ফেথ') নিয়ে সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন, '''সদুদ্দেশ্য' বলে গণ্য হওয়ার জন্য যে পরিমাণের ও যে গুণমানের সততা লাগে তা ঘটনাক্রম দ্বারা এবং কথাটি যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিধিনির্দেশের উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত।'' রায়ে আরও বলা হয়েছে যে, ''সাধারণত অভিযোগ করা হয় যে আইনসঙ্গত কর্তব্যকর্মে এই আইন ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু তার দ্বারা এটা বোঝায় না যে তা 'অসদুদ্দেশ্যে' করা হয়েছে।'' আদালত জোর দিয়ে বলেন, 'সদুদ্দেশ্য' ছিল না এই সিদ্ধান্তে আসতে হলে জোরালো ও তর্কাতীত তথ্যপ্রমাণ চাই...''। কিন্তু ফৌজদারি আদালত তো কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া তথ্যপ্রমাণ দেখতে পারে না।...

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ''সদুদ্দেশ্য''-র ধারণাকে ভাঙার ''কোনো ভিত্তি আছে কিনা'' সেটা দেখাটাও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া করা যাবে না। এভাবে সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে 'সদুদ্দেশ্য'' নয়, সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তা প্রমাণ করাটা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছেন, আর এখানে কর্মরত অর্থ ২৪ ঘণ্টা। তাই বলা যায় সামরিক বাহিনীর লোকের জন্য সম্পূর্ণ আইনি সুরক্ষা রয়েছে।

সশস্ত্র সংঘাতের অর্থ, সামরিক বাহিনীর জন্য ''পৃথক আইন''

সামরিক দমনের শিকার সাধারণ নাগরিকের জন্য যদি ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে, *আফস্পা* বাতিল হলেও, সেনাবাহিনী আইনগতভাবে রেহাই পেয়ে যাবে। পাথ্রিবাল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলেন, ''রেহাই স্বাধীনতার নামান্তর— সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনরত কর্তৃপক্ষের উপর ব্যতিক্রম হিসাবে অর্পিত হয়। এই আইন বা কাজটা এমন, যার জোরে একজন কর্মচারী তার পদাধিকারের কারণে ক্ষমা পেয়ে যায়।''[৭]

এটাই জম্মু কাশ্মীর নাগরিক মোর্চা রচিত ''অভিযুক্ত অপরাধী''(Alleged Perpretrators) রিপোর্টের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। এই রিপোর্ট ২১৪টি ঘটনা খুঁটিয়ে গবেষণা করে শুধু যে ৫০০ অপরাধীর নাম পেয়েছিল তা নয়, অপরাধী যদি সেনা হয় এবং অপরাধ যদি ''উপদ্রুত এলাকায়'' সংঘটিত হয়, সেক্ষেত্রে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে ভারতীয় দণ্ডবিধির অক্ষমতাকে বেআব্রু করে দিয়েছিল। ''উপদ্রুত এলাকায়'' নিযুক্ত জওয়ানদের সুবিধা ও সুরক্ষা প্রদান ক'রে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা, সাধারণ নাগরিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ রুদ্ধ করেছে। অন্য দিকে, ঐ সমস্ত এলাকায় ফৌজদারি আদালতগুলিকে মামলা গ্রহণের অনুমোদন না দেওয়ার ফলে এবং সেনাবাহিনীর কোর্ট মার্শাল উৎপীড়িতের আত্মীয়-পরিজনদের স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে নাগরিকরা সুবিচারের অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

ভারতীয় সেনাদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে এটা জঙ্গিদের একটা কৌশল, এই অজুহাতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী সবসময়ই ঘটনাগুলি অস্বীকার করায় এবং নির্যাতিতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযোগ আনার ফলে সমস্যা আরও জটিল হচ্ছে। ১৯৯১ সালে *কুনান পসপোরায়* সামরিক বাহিনী দ্বারা গণধর্ষণের ঘটনাটিকে, ভারতের প্রেস কাউন্সিল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অপযশ ছড়াবার জন্য জঙ্গিদের ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেয়। মনোরমা দেবীকে অপহরণ, অত্যাচার, বন্দি অবস্থায় ধর্ষণ ও হত্যার (১১ জুলাই, ২০০৪) ঘটনার বিচারই

শুরু হলো না। সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন আসাম রাইফেল-এর জওয়ানরা এখনও মুক্ত, কেননা আসাম রাইফেলস তাদের জওয়ানদের অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য মণিপুর রাজ্য সরকারের তদন্ত কমিশন গড়ার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। সুতরাং, সশস্ত্র সংঘর্ষের অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার এক প্রহসন।

তর্ক করা হয়, কোর্ট মার্শাল অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর আদালত কঠিন শাস্তি দেয় এবং ফৌজদারি আদালতের তুলনায় কম সময় নেয়। কিন্তু এটা তখনই হয়, যখন ঘটনাটি ঘটে সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে— অভিযুক্ত এবং নিগৃহীত, উভয়েই যখন ফৌজি। কোনো জওয়ান যদি কোনো অফিসারকে লাঞ্ছিত করে, তখন তদন্ত ও বিচার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার সংঘটিত করে, সেক্ষেত্রে সামরিক আদালত সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের অনুকূলে দারুণ ঝুঁকে পড়ে। সামরিক আদালতে সাধারণ নাগরিকরা স্বীকৃতি পায় না। সামরিক আদালত যখন নিজ বাহিনীর সৈনিকদের শৃঙ্খলা রক্ষা, মান্যতাপরায়ণতা, আদেশপালন কিংবা চাকুরি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বিষয় বিচার করে, তখন হয়ত সে ঠিকঠাক ভূমিকা পালন করে, কিন্তু উপদ্রুত এলাকায় সাধারণ নাগরিকের উপর দুর্বৃত্ত আচরণের কারণে যখন সে কোন সেনার অপরাধের তদন্ত ও বিচার করে, তখন সামরিক বিচারালয় সুবিচার প্রদানে একেবারেই অক্ষম।

সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি সত্যিই সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করার এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অভিলাষী হতেন, তাহলে তাঁরা ফৌজদারি আদালতকেই বেছে নিয়ে বলতে পারতেন, বন্দি মৃত্যু এবং ধর্ষণ সৈনিকদের "ডিউটি"র মধ্যে পড়েনা এবং ফৌজদারি আদালতই অভিযুক্তদের বিচার করুক, সেনা আদালত বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এটা দিয়ে আমরা কী করি?

ভারতবর্ষের ৬৩০টি জেলার মধ্যে ১০১টি জেলায় *আফস্পা* বলবৎ করা হয়েছে এবং ৮২টি জেলায় অপারেশন গ্রিন-হান্ট চলছে। যেসব স্থান এসব থেকে মুক্ত, সেই ৪৪৭টি জেলায় যদি কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং তাতে যদি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর কেউ জড়িত থাকে, ফৌজদারি আদালত সেইসব অপরাধ বিচার করার ক্ষমতা রাখে। তার অর্থ, এই সকল এলাকায় সকল 'সাধারণ অপরাধ' বিচারের জন্য একটি আইনই প্রযুক্ত। কাশ্মীর, মণিপুর, অংশত আসাম, মধ্যভারতের আদিবাসী এলাকা ইত্যাদি অঞ্চলে— 'পাথ্রিবাল' মামলার পরিণতিই সেখানকার রীতি। সশস্ত্র বাহিনী আপনজনদের কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। সৈনিকদের বিচারে অসামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত দীর্ঘস্থায়ী মামলায়, নিজ বাহিনীর ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখার জন্য, সেনাবাহিনী প্রাণপণ বিরোধিতা করে। এবং অধিকাংশ মামলাই, পাথ্রিবালের মতো, বিচারের আগেই শেষ হয়ে যায়[৮]।

আরো কয়েকটি বিতর্ক বর্তমান। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সংগ্রামে রত কাশ্মীরী জনতাকে দমন করতে যে সৈন্যরা নিযুক্ত, তারা পাকিস্থানের ছায়াযুদ্ধের বিরুদ্ধেও নিয়োজিত। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, কাশ্মীরী মুসলমানদের দমন করে তারা আসলে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ভারতীয় জন-মনোরঞ্জনকারী সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রচারিত পাকিস্থান-বিরোধী তীব্র ঘৃণা সৈনিকদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে[৯]। অফিসাররা যখন সৈনিকদের সন্ত্রাসবাদী দমন করার নির্দেশ দেয়, তারা সৈন্যদের বোঝায় যে তারা আসলে ঘৃণ্যতম শত্রু পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সন্ত্রাসবাদী দমননীতির মর্মবস্তু হলো, সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক বাহিনীকে অপ্রতিহত পরিচালন ক্ষমতা প্রদান। ছায়াযুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিকদের প্রশিক্ষণ এবং "ডিউটি" এমনই যে সাধারণ নাগরিকদের বর্বরভাবে দমন করতে তাদের বিবেক এতটুকু দংশন করেনা।

সবশেষে, *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-য় (৭ জুন ২০১৪) প্রকাশিত উত্তরপ্রদেশ পুলিশ-এর "যাদবায়ন"-এর খবরটিকে যদি সত্য বলে মানি, অর্থাৎ যাদব অধ্যুষিত উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বাহিনী অ-যাদবদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে, তাহলে এটা বলতে হয়, কাশ্মীরী মুসলমান, নাগা খ্রীস্টান কিংবা মেইতিদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত অ-মুসলিম (বা অ-খিস্টান বা অ-মেইতি) সৈনিক-প্রধান কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয় জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব বহন করেনা। এবং অ-হিন্দু প্রধান এলাকায় তাদের নিয়োগ জনগণকে দমন করার জন্য বহিরাগত বাহিনী হিসাবে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং আমরা যে প্রশ্নটার মুখোমুখি হই, আমরা কি বিশ্বাস করি যে ভারতের অভ্যন্তরে নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, নাকি আমরা এখনও ভান করবো যে, 'জঙ্গি', 'অপরাধী'-দের বিরুদ্ধে এগুলো নিছকই "পুলিশি অভিযান"। দুটোরই তাৎপর্য আছে। যদি যুদ্ধের বাস্তবতা স্বীকার করি, তাহলে জেনেভা সম্মেলন এবং প্রোটোকল-২ কার্যকর করার প্রশ্ন আসে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি এবং বাধ্যবাধকতা-গুলিও মান্যতা দিতে হয়। যুদ্ধ/সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ে অনুষ্ঠিত অপরাধগুলি গভীর তদন্তের দাবি রাখে এবং সামরিক বাহিনীকে প্রদত্ত সুরক্ষা অনেকটা কাটছাঁট করতে হয়। এসব অস্বীকার করাটাই যদি ভারত সরকারের প্রধান প্রবণতা হয় এবং যুদ্ধকে "পুলিশি অভিযান" হিসাবেই দেখা হয়, তাহলে আবার *আফস্পা*-র কোন প্রয়োজন থাকে না, (সেনাবাহিনীর) আইনি সুরক্ষা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং নাগরিকদের উপর সেনা কর্তৃক নির্যাতনের অপরাধ বিচারে সামরিক আদালতের এক্তিয়ারও থাকেনা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই স্বদেশে নিজ জনগণের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া হলো,

আমাদের দেশে যাঁরা ইসলাম বা খ্রীস্টান ধর্ম, এমনকি শিখ ধর্ম অনুসরণ করেন বা হিন্দু মেইতি-রা, জাতিসত্তাগতভাবে যারা পৃথক, তাঁরা উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং জাতিগত/সাম্প্রদায়িক বিষের বাহকে পরিণত হয়ে ওঠেন।

অতএব আমরা বিচ্ছিন্নতা, অথবা বলা যেতে পারে, অন্য প্রকার এক বিশেষ অবস্থানের মুখোমুখি হই। এটা যাঁরা অস্বীকার করেন, এমনকি 'সংখ্যাগরিষ্ঠরাও' মনে করেন, নাগরিকদের একরকম 'আইনের শাসনের' সুরক্ষা প্রয়োজন। পরিবর্তে সশস্ত্র সংঘর্ষের এলাকায় 'সমর কানুন' সেখানকার নাগরিকদের সকল প্রকার অধিকার ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে এবং বিপরীতে সেনারা আইনি সুরক্ষা লাভ করে আইনের উর্ধ্বে চলে যায়। সুতরাং, কাশ্মীরকে অঙ্গীভূত করা কিংবা নির্দয় বলপ্রয়োগ করার দাবি করার পূর্বে, অভিন্ন ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করো। নাগরিকত্বের অর্থ আইনের চোখে সমতা এবং জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, নাগরিকদের ওপর সমর-কানুন চাপিয়ে দেওয়া নয়। স্পষ্টত, ভারত রাষ্ট্র এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত নয়।

সমস্যা হলো, নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সরকারের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে কোন আন্দোলন নেই। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মতো গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ দাবি যারা উত্থাপন করছে অথবা জঙ্গল, জমি, জীবন বাঁচাতে এবং যে স্বেচ্ছাচারী প্রশাসন ভূগর্ভস্থিত সম্পদ লুঠ করার কাজে দেশি-বিদেশি সংস্থাকে নিয়োগ করছে, তার বিরুদ্ধে যারা লড়াই-সংগ্রাম করছে— এদের দমন করার জন্য যে সৈন্যরা নিয়োজিত, তারা 'শহিদ'-এর সম্মান পাচ্ছে— এটা এক অবিচারপূর্ণ ব্যবস্থাকে এবং আত্মরক্ষার্থে সংগ্রামরত মানুষদের 'অ-মানব' পরিণতির প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে। সুতরাং প্রশ্ন হলো, জনগণ কিংবা জনসমষ্টির একাংশ তাদের ঐহিক অস্তিত্ব বিপন্নকারী 'প্রাতিষ্ঠানিক অবিচার' যদি মেনে না নেয়, আমরা তাদের কী বলতে পারি? এটাই মূল প্রশ্ন।

রাষ্ট্রীয় নীতিগত ক্ষেত্রে স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বেআইনি ঘোষণা এবং জঘন্য অপরাধের বিচার থেকে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য তাদের বিশেষ সুবিধা বাতিলের দাবির সঙ্গে শান্তির অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে পৃথক করা যায় না। আমাদের ভাবনার কেন্দ্র হবে— "ছায়াযুদ্ধ" "আফগান পরিস্থিতি" উদ্ভূত আতঙ্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে গৌণ করে দেখা এবং অতিরিক্ত ভীতিপ্রদর্শনের বদলে জনগণকে মুখ্য গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাধানের পথ অনুসরণ করা[১০]। ইরম শর্মিলার বারো বছর ব্যাপী অনশন এবং *আফস্পা*-বিরোধী পাঁচ দশকের যুদ্ধ থেকে আমাদের উপলব্ধি হওয়া উচিত যে সশস্ত্র বাহিনীর আইনি রেহাই রোখবার জন্য নীতিগত এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসাবে, স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি তোলার সময় এসেছে। যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করে নিলে, সরকার সেনাদের রেহাই দেওয়ার যুক্তি জোরদার করতে সক্ষম হবে। আমাদের স্বার্থচিন্তাই, দেশবাসীর বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে প্ররোচিত করে, যাতে নাগরিকদের দুর্বল করার জন্য ও সেনাবাহিনীকে ক্ষমতাশালী করার জন্য কোন বিশেষ আইন লাগু না করা হয়। সামরিক পদ্ধতির স্থলে এই পথেই একমাত্র রাজনৈতিক সমাধানের সন্ধান মিলতে পারে। এটা হয়ত একটু বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা নিশ্চয় আশা করা যায় না যে সভ্য সমাজের যা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য, আইনের চোখে সমানাধিকার, সেটা যদি অস্বীকৃত হয়, তাহলেও কেউ ভারতে থাকতে চাইবেন। আমাদের নিজেদেরকেই প্রশ্ন করা উচিত, আমাদেরকেও যদি "বিশেষ অবস্থানে" (Special Status) নামিয়ে আনা হয়, যেখানে কোন আইনি সুরক্ষা পাওয়া যাবেনা, আমাদের শত্রুতে পরিণত করা হবে, যেখানে কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত ভারতে স্বাধীনতার উচ্চারণ "বেআইনি" এবং "জাতীয়তা বিরোধী", সেখানে প্রতিরোধ না করে আমরা কেন বশ্যতা স্বীকার করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকবো? এই যে বিভাজন করে রাখা হয়েছে, তাতে আমাদের অবস্থান কী? যারা ভারত থেকে স্বাধীনতা চাইছে অথবা যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা নির্মাণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করছে, তাদের বিরুদ্ধে তর্জনগর্জন এবং গলাবাজি না করে, যারা ভারতের "ঐক্য ও সংহতি"-র প্রবল সমর্থক, তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা উচিত, সকলের জন্য সমান ফৌজদারি আইনের প্রবর্তন সম্পর্কে তাদের অবস্থান কী? এইখান থেকে শুরু করলে, আমরা এই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারবো না যে, যখন তাদের দমন ও কণ্ঠরোধ করতে ভারতীয় ফৌজ যখন পাঠানো হয়, তখন সেই মানুষগুলো কী দাবি করছিলো।

পাথ্রিবাল বিচার আমাদের এটা ভাবতে বাধ্য করেছে।

টীকা

১। একটা মত আছে যে, ২০০৮ সালের জম্মু বিক্ষোভ আঞ্চলিক বৈষম্য উদ্ভুত। কিন্তু সরকারি তথ্যে এই অনুমানের সমর্থন মেলে না। ২০০৭-০৮ সালের জম্মু-কাশ্মীরের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, বর্তমান ও স্থির মূল্যে মোট আয়ের বিচারে (GSDP at current and constant prices) শ্রীনগর, জম্মু, কাথুয়া, পুলওয়ামা, উধমপুর, এবং রাজৌরি-র অবস্থান ক্রমানুসারে শীর্ষস্থানে। অধোস্থানে আছে কুপওয়ারা, কার্গিল, দোদা, লে ও পুঞ্চ। এর সঙ্গে যদি ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত কাশ্মীর, জম্মু ও লাদাখ-এর মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়, স্পষ্টত কাশ্মীরের অবস্থান জম্মু ও লাদাখের পরে। ২০০৮-০৯ সালে মাথাপিছু ব্যয়বরাদ্দ— জম্মু : ৪৮১৮.৫২ টাকা, লাদাখ : ৪১৪৭.৩০ টাকা, কাশ্মীর : ৪০৮১.২১ টাকা। ২০০৮-০৯ সালে মোট ব্যয়বরাদ্দ, কাশ্মীরের ৬৭ লক্ষ মানুষের জন্য ২৭৫৭ কোটি টাকা, জম্মুর ৫৪ লক্ষের জন্য ২৬৩২ কোটি টাকা, লাদাখের ২.৯১ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ১২১

কোটি টাকা। তথ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন পরিষ্কার। জম্মু এবং কাশ্মীর, যে জেলা দুটিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, সেই জেলা দুটির পরিস্থিতি, অ-মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলির তুলনায় বেশ খারাপ।

২। যদিও আমি কাশ্মীর প্রসঙ্গ বেশি উল্লেখ করেছি, কিন্তু সেনাবাহিনীকে প্রদত্ত বিধিগত রেহাই এবং অব্যাহতি দেওয়ার প্রশ্নে নাগরিকদের অসহায়তার চিত্রটা মণিপুর, নাগা অঞ্চল, আসাম, গ্রিনহান্ট কবলিত ৯টি জেলা-র বাস্তবতা থেকে পৃথক নয়। সেই অর্থে, জম্মু-কাশ্মীরের উদাহরণ, অন্যান্য এলাকা, যেখানে যুদ্ধ চলছে, সেখানকার পরিস্থিতির উপরও আলোকপাত করে।

৩। কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর সনদেও সেনা আইন (Army Act) মতো একই প্রকার, প্রায় অভিন্ন ভাষ্য বর্তমান। সীমান্তরক্ষী আইনের (Border Security Force Act) ৪৭ নং ধারায় হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধে 'ফৌজি আদালতে' (General Security Forces Court) সাধারণ নাগরিকদের বিচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু রক্ষীরা যখন 'সক্রিয় দায়িত্বে' (Active duty) থাকে, তখন এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকেনা। আইনে 'সক্রিয় দায়িত্ব' বলতে বোঝায়— ১) "শত্রুর বিরুদ্ধে যখন অভিযানে নিয়োজিত", ২) "ফাঁড়িতে কর্তব্যরত অথবা সীমান্তে চৌকি কিংবা প্রহরার কাজে নিযুক্ত"(২এ ধারা)। সেনা বিধির ১২৫ ধারার মতো সীমান্তরক্ষী বিধির ৮০ ধারাতেও বিএসএফ-কেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আদালত বাছাই করার। আর শত্রুর সংজ্ঞা— "সকল সশস্ত্র অভ্যুত্থানকারী, সশস্ত্র বিদ্রোহী, সশস্ত্র দাঙ্গাকারী, দস্যু এবং এমন সশস্ত্র লোক, যার বিরুদ্ধে এই আইনে ব্যবস্থা নেওয়া যায়"[২(১)(১) ধারা]।

৪। *Alleged Perpetrators : Stories of Impunity in Jammu and Kashmi r*: December 2012; www.kashmirprocess.org

৫। Praveen Swami, *The Massacre at Chattisinghpora*

রিপোর্টে ছত্তিসিংপোরায় রক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, গুলিবর্ষণের আগে হত্যাকারীরা "ভারত মাতা কী জয়" এবং "জয়হিন্দ্" ধ্বনি দিয়েছিল। একজন রাম টানছিল। কেউ কেউ একজন সৈন্যকে অন্যজনকে "গোপাল" বলে ডাকতে শুনেছিল। মহম্মদ সুহেল ও ওয়াসিম আহমেদ নামে যে দুজন তথাকথিত পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীকে ছত্তিসিংপোরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের ১২ বছর বাদে নিরপরাধ বলে আদালত মুক্তি দিয়েছিল।

৬। সিবিআই সুদূরতম কল্পনাতেও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বস্ততার আদর্শ প্রতিষ্ঠান নয়। সোপিয়ান খুনের (মে ২০০৯) মতো অনেক তদন্ত তারা চাপা দিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটা চার্জশিট তার স্বতন্ত্র মূল্যে বিচার করতে হবে। পাথ্রিবাল তদন্তেও সিবিআই সুকৌশলে অন্যান্য দিক বিচার করা এড়িয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এটা (সোপিয়ান খুন) কি কয়েকজন আর্মি অফিসারের প্রতিশোধমূলক কাজ? সম্প্রদায়গত ঘৃণাবশত কি এই কাজ করা হয়েছিল? না হলে কী করে এত সহজে কাশ্মীরী মুসলমান নাগরিকদের হত্যা করা সম্ভব হলো? উপরতলার ব্যক্তিরাও কি এই কাজে যুক্ত ছিল? না হলে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্তাব্যক্তিরা ফৌজদারি মামলা চাপা দিতে এত ব্যগ্র ছিল কেন? সরকারি মেডিক্যাল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের প্রধানকে রক্তের নমুনা জাল করতে কে প্ররোচিত করেছিল? পাথ্রিবাল হত্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও কেন জালিয়াতির জন্য আলাদা মামলা করা হলো? তা কি উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং সিবিআই-কে আড়াল করার জন্য?

৭। সেনা আইনের ১২৫ ও ১২৬ ধারা সম্পর্কে আদালতের বক্তব্য উপলব্ধির জন্য পাথ্রিবাল মামলার দুটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো:

> 57. The CJM Court gave option to the higher authorities of the Army to choose whether the trial be held by the court-martial or by the criminal court as required under Section 125 of the Army Act.Mr. P.P. Malhotra, learned ASG, has submitted the original file of the Army Authorities before the court, File notings reveal their decision that in case it is decided by this Court that sanction is required and the Central Government accords sanction, option would be availed at that stage.
>
> 58. Military Authority may ask the criminal court dealing with the case that the accused would be tried by the court-martial in view of the provisions of Section 125 of the Army Act. However, the option given by the Authority is not final in view of the provisions of Section 126 of the Army Act. Criminal court having jurisdiction to try the offender may require the competent military officer to deliver the offender to the Magistrate concerned to be proceeded according to law or to postpone the proceedings pending reference to the Central Government, if that criminal court is of the opinion that proceedings be instituted before itself in respect of that offence. Thus, in case the criminal court makes such a request, the Military Officer either has to comply with it or to make a reference to the Central Govt. whose orders would be final with respect to the venue of the trial. Therefore, the discretion exercised by the Military Officer is subject to the control of the Central Govt. Such matter is being governed by the provisions of Section 475 Cr.P.C. read with the provisions of the J & K Criminal Courts and court-martial (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1983.

৮। আমাদের প্রতিবেশী নেপাল ২০০৬ সালে তাদের সেনা আইনের ২২ ধারায়, সেনাবাহিনীকে রেহাই দেওয়ার সুযোগ বাতিল করেছে। তাদের ১৯৫৯ সালের পুরাতন সেনা আইন এই মর্মে সংশোধিত হয়েছে।

৯। আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলির রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে পাকিস্থান একা নয়। মালেগাঁও (২০০৮) ঘটনার আগে, ভারত সরকার গণহত্যাগুলির তদন্ত করার ক্ষেত্রে কতটা উদ্যোগী এবং স্বচ্ছ ছিল? এরকম সব ঘটনার জন্য তারা অন্ধভাবে মুসলমানদের উপর সন্দেহের বোঝা চাপিয়ে দিত। সমঝোতা এক্সপ্রেস (ফেব্রুয়ারি ২০০৭), মক্কা মসজিদ (মে ২০০৭), আজমীর শরিফ (অক্টোবর ২০০৭) প্রভৃতি বোমা

এর পর ৩৯ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও পুঁজিবাদ— ইবোলা : একটি কেস স্টাডি

সমু

প্রাককথন

সম্প্রতি মার্কিন মিডিয়া 'আমেরিকায় ইবোলা এসে গেছে' বলে খুব হইচই জুড়ে দিয়েছে। কিছু 'কেস'ও ধরা পড়েছে। কিন্তু নেপথ্যের ঘটনা কোথাও কোনও টিভি চ্যানেল কিম্বা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আসছে না। একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য মার্কিন মুলুকে তা আসার কথাও না। কিন্তু এই ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ আর একবার পুঁজিবাদের স্বরূপকে চিনিয়ে দিয়েছে। আর একবার চিনিয়ে দিয়েছে তার বাজারমুখী এক চূড়ান্ত অমানবিক মুখকে। এই আলোচনা তাই শুধু ইবোলা নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ইবোলা-কে যদি একটা প্রতীক হিসেবে ধরে নিই, তাহলে এই আলোচনার মূল অভিমুখ হবে পুঁজিবাদের অধীনে জনস্বাস্থ্যের মত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কী হাল হচ্ছে, কীভাবে নানা ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশনগুলো ঢাকঢোল পিটিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে হরেক বৈজ্ঞানিক(!) উদ্ভাবন ক'রে সেগুলির পেটেন্ট নিয়ে আসলে বহু ক্ষেত্রে নতুন বোতলে পুরোনো নানা ওষুধকেই বাজারে চালিয়ে বছর বছর লক্ষ-কোটি ডলার আয় করছে— সেদিকে। আর, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পুঁজিবাদের পণ্যায়িত জ্ঞানের বাজারের যে নানা ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব, বর্তমান কালের বিজ্ঞানের দর্শন হিসেবে আংশিকতাবাদ বা খণ্ডতাবাদ (Reductionism) এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার খণ্ডীকরণ (Institutional fragmentation of research) যেভাবে সেই ধারণাগুলোকে আরও জোরালোভাবে হাজির করছে সমাজে— সেদিকেও।

আধুনিক ইউরোপীয় বা মার্কিন বিজ্ঞান চর্চা ও তার নানা গবেষণা তথা জ্ঞান আসলে বুর্জোয়া বিপ্লবের ফসল। আধুনিক পুঁজিবাদের সাথে বিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়া ও নানা আদানপ্রদান উদারনৈতিক প্রগতিশীলতার ভাবাদর্শ (Ideology of liberal progressivism) মেনে চলে। বুর্জোয়া উদারনীতির মতোই তাই এই বিজ্ঞানও সাধারণভাবে উদারনৈতিক ও অমানবীকৃত (Dehumanized)। তাই আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক চিকিৎশাস্ত্র আর তাদের নানা গবেষণা— সবই চলে বাজারের নিয়ম মেনে। বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র এরা নিজেরাই যেহেতু এককেটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংগঠন (Social institution), তাই এদের করায়ত্ত করার মাধ্যমে পুঁজিবাদ আসলে এক গভীর সামাজিক আধিপত্যবাদ কায়েম করতে সমর্থ হয়েছে। তাই, বর্তমান পৃথিবীতে মহামারী বা কোনো সঙ্কটকে দেখার পরিপ্রেক্ষিত ও দিশাকে সঠিক অভিমুখ দিতে হলে এই বিষয়গুলিকে মাথায় রাখা খুব জরুরি। নইলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ বা মহামারীর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পরিসরও যে ক্রমেই সংক্রমিত হয়ে উঠছে, ও শীঘ্রই সেসবেরও নির্বীজকরণ প্রয়োজন, সে বিষয়টা থেকে আমাদের দৃষ্টি ঘুরে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ, মানুষের সমাজে যে কোনো ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাবের (Outbreak) পেছনে কোনো না কোনো আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক কারণ সবসময়েই বিদ্যমান থাকে, কারণ জীবাণু দ্বারা রোগের বিস্তার কোনো অপার্থিব বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নয়, তার বীজ লুকিয়ে থাকে পৃথিবীরই প্রাকৃতিক পরিবেশ, এবং সভ্যতা কর্তৃক তার নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মধ্যেই। মানুষ সেই প্রকৃতি ও পরিবেশের অংশবিশেষ হওয়ায় একে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মার্ক্স যথার্থই বলেছেন : প্রকৃতি হলো মানুষের জীবনের আঙ্গিক অংশ (Organic Part)।

ভূমিকা : ইবোলা

নানা ভাইরাসের মধ্যে ইবোলা ভাইরাস (পরিভাষায় এক ধরনের Filovirus) বেশ মারাত্মক। এটি প্রধানত আক্রমণ করে প্রাইমেট বর্গের প্রাণীদের (বাঁদর, শিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি ও মানুষ)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) নির্দেশিকা অনুযায়ী এই ভাইরাস সংক্রান্ত যে কোনো গবেষণা বা চিকিৎসা হওয়া উচিত Biosafety Level-4 সুরক্ষামান অর্জন করেছে এমন ল্যাবরেটরিতে। (এখানে উল্লেখ্য যে, AIDS/HIV-এর গবেষণা বা চিকিৎসার জন্য Biosafety Level-2 সুরক্ষামান অর্জিত ল্যাবরেটরিই যথেষ্ট)। পরিচিত অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের মত ইবোলা সংক্রমণেরও প্রথম লক্ষণগুলো হলো ৮-১০ দিন ধরে মাথাব্যথা, জ্বর, গা-হাত-পা ব্যাথা, কখনো কখনো বা ত্বকের কোথাও কোথাও র‍্যাশজাতীয় কিছু বেরোনো, কিম্বা ডায়রিয়া বা বমি। কিন্তু এরপরই এই ভাইরাসের সংক্রমণের বিশেষত্ব চোখে পড়ে। যার পারিভাষিক নাম হল Acute Haemorrhagic Fever— জ্বরের পাশাপাশি হঠাৎ রক্তক্ষরণ শুরু হয় বমি বা মূত্রের সাথে। ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, ফলে চামড়া রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে। চোখ-মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। দেহের রক্তবাহী নালিগুলো (শিরা/ধমনী) ফেটে যেতে থাকে এবং সেখান থেকে শরীরের অভ্যন্তরে অবিরাম রক্তক্ষরণ হতে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে রক্তচাপ মারাত্মক কমে যায়। এরপর হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে (Multi-organ Failure) এবং শেষ পর্যন্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে।

যদিও এখনো পর্যন্ত খুব নিশ্চিতভাবে ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা বুঝে উঠতে পারেননি যে প্রাকৃতিক কোন্ উৎস এই ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল, তবু যে ধারণাটা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে জোরালো তা হলো, ফল খায় যেসব বাদুড়, তারাই এই ভাইরাসের বাহক। মূলত আক্রান্ত প্রাণিদেহ থেকে নিঃসৃত তরল বা ক্ষত থেকে এই ভাইরাস ছড়ায়।

ইবোলা-র কথা প্রথম (ইবোলা-সুদান) জানা যায় ১৯৭৬ সালে— সুদান ও জাইরে-তে (এখন গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো)। 'ইবোলা' নামটিরও উদ্ভব সেখান থেকেই— জাইরে-র একটি নদী ইবোলা-র নামে রোগটির নামকরণ করা হয়। কারণ সেসময় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল ইবোলা নদীর দুই ধারের জনপদে। যাই হোক, সেসময়ে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রায় ২৮৪ জন মানুষ, যাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ মারা গিয়েছিলেন।

এর কয়েক মাস পরে দ্বিতীয়বার ইবোলা আঘাত হানে জাইরে'র ইয়াক্কু-তে (ইবোলা-জাইরে বা EBOZ)। এবারে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। ৩১৮ জন আক্রান্ত হন, তার মধ্যে ৮৮ শতাংশই মারা যান। এটিই তখনো পর্যন্ত ইবোলার সবচেয়ে মারাত্মক ও আগ্রাসী আক্রমণ। নানা অভিজ্ঞ ডাক্তার আর বিজ্ঞানীরা অনেক মাথা খাটিয়েও এই ভাইরাসের প্রাকৃতিক উৎস সম্পর্কে কোনো ধারণাতেই তখন আসতে পারেননি।

এরপর ইবোলা তৃতীয়বার আঘাত হানে ১৯৮৯ সালে। নাম দেওয়া হয় ইবোলা রেস্টন (EBOR)। ফিলিপিন্স থেকে কিছু বাঁদরকে আনা হচ্ছিল ভার্জিনিয়ার রেস্টন শহরে; তাদের শরীরে এই ভাইরাসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও সেসময়ে যেসব ব্যক্তি এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হন তারা ইবোলা হিমোরেজিক ফিভার পর্যন্ত পৌঁছননি, মারাও যাননি। আর সেই পর্যায়ে শেষবারের মত এই ভাইরাস দেখা যায় ১৯৯৪ সালে, আইভরি কোস্টে (EBO-CI)। এটি পাওয়া যায় এক মহিলার দেহে। তিনি ছিলেন প্রাণী-ব্যবহারবিদ্যা বিষয়ের (Ethology) গবেষক। একটি মৃত শিম্পাঞ্জির ময়নাতদন্ত (Necropsy) করার সময় অসাবধানবশত তিনি নিজেকে এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করে ফেলেন।

ইবোলা ও পশ্চিম আফ্রিকার সংক্রমণ : ২০১৪

১৯৯৪ সালের পর বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ইবোলা'র সংক্রমণ দেখা যায় :

সাল	*দেশ*	*আক্রান্তের সংখ্যা*	*মৃত্যুর সংখ্যা*	*মৃত্যু শতাংশ*
২০১২	উগান্ডা	৬	৩	৫০
২০১২	কঙ্গো	৩৬	১৩	৩৬.১
২০১২	উগান্ডা	১১	৪	৩৬.৪
২০১১	উগান্ডা	১	১	১০০
২০০৮	ফিলিপিন্স	৬	০	০
২০০৭	উগান্ডা	১৪৯	৩৭	২৫
২০০৭	কঙ্গো	২৬৪	১৮৭	৭১
২০০৩	কঙ্গো	১৪৩	১২৮	৯০
২০০০	উগান্ডা	৪২৫	২২৪	৫৩
১৯৯৫	কঙ্গো	৩১৫	২৫৪	৮১

সূত্র : Centres for Disease Control and Prevention (CDC)

দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৪-পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার আঘাত হেনেছে ইবোলা। ২০১৩ সালে সে ফেরে প্রবলভাবে। এবার লক্ষ্যস্থল পশ্চিম আফ্রিকা। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম দেখা গেল গিনি-তে; তারপর তা ছড়িয়ে গেল লাইবেরিয়া আর সিয়েরা লিওন-এ। নাইজেরিয়াতেও প্রায় ২০টি সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। একটি সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে সেনেগালে, যদিও সেখানে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে যে, পরিস্থিতি আয়ত্তে আছে, ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত হু ও সিডিসি-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৯২১৬ জন, আর তার মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫৫৫ জন (এদের মধ্যে ৪৯৯৫টি সংক্রমণ ও ২৭২৯টি মৃত্যুর খবর ল্যাবরেটরি থেকে নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেছে)। যদিও হু-র মতে, এই পরিসংখ্যান থেকে ইবোলা-সংক্রমণের আসল ছবিটা পাওয়া কঠিন এবং এটি আসলে বাস্তব ছবিটাকে অনেক লঘু করে দেখায়। তথ্য আর রিপোর্ট আজ পর্যন্ত যা হাতে এসেছে, বাস্তবে সম্ভবত এবারকার সংক্রমণের ব্যাপ্তি তার চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। হু-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-জেনারেল গত ১৪ই অক্টোবর জেনেভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ১০০০ জন নতুন করে ইবোলা ভাইরাসে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ইবোলা ভাইরাসে সংক্রমণের সংখ্যাটা বিগত সব বারের মোট সংখ্যাকে ছাপিয়ে গেছে। এর মধ্যে মৃত্যুর হার ৭১ শতাংশে পৌঁছেছে।

এই ভাইরাসের প্রভাব থেকে নিজেদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পশ্চিম দুনিয়ার নানা দেশ তাদের সাথে ইবোলা-আক্রান্ত দেশের সীমান্ত সীল করে দেওয়া, এয়ারপোর্টে নানারকম কড়াকড়ি, বিদেশ থেকে আসা প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করা প্রভৃতি করছে। পাশাপাশি, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতিরা ইবোলা-আক্রান্ত দেশে মেডিক্যাল ক্যাম্প খুলছে। ১৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ঘোষণা করেন, প্রায় ৪০০০ মার্কিন সেনাকে পাঠানো হয়েছে, যারা ঐসব অঞ্চলে ১৭টি বা তার বেশি ইবোলা ট্রিটমেন্ট ক্যাম্প তৈরি করবে। এগুলিতে সর্বমোট শয্যাসংখ্যা হবে ১৭০০টি।

ইবোলা ও এক সুদীর্ঘ বঞ্চনা আর অসাম্যের ইতিহাস

ইবোলা-র আবির্ভাব আজ থেকে ৪০ বছর আগে হলেও এ নিয়ে পরবর্তী ৪০ বছরে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনোরকম হেলদোল দেখা যায়নি। ফলে এটি রয়ে গেছে ভয়ানক একটি মারণ ব্যাধি হিসেবেই। কারণটা বোঝা কঠিন নয়, ৪০ বছর আগে মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার যেসব জায়গা ও সেখানকার যেসব মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত গরিব দেশের গরিব মানুষ। তাঁরা যেসব জনপদগুলোতে বসবাস করতেন, সেগুলো আয়তনে ছিল ক্ষুদ্রাকার। সেইসব জনপদগুলোর সাথে বাইরের পৃথিবীর তেমন যোগাযোগও ছিল না। তাই সেই ইবোলা-আক্রান্ত কালো আফ্রিকানদের মৃত্যুর তেমন কোনো প্রভাবই পড়েনি কোথাও। আর তাছাড়া, এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ তখন মারা যেতেন ম্যালেরিয়া, কলেরা এমনকি ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও। কাজেই সেসময় ইবোলা ভাইরাসের উৎস কিম্বা চিকিৎসাপদ্ধতি বা নিদেনপক্ষে রোগ-শনাক্তকরণের কোনো পদ্ধতি নিয়ে কেউই আর তেমন মাথা ঘামায়নি।

অন্যান্য ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কথা যদি ধরা হয়, যেমন ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী, তাতে মারা গিয়েছিলেন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, তাতে মৃত্যুর হার ছিল সংক্রমণের ২.৫-৫ শতাংশ। সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মৃত্যুহার থাকে সংক্রমণের ০.১ শতাংশের কম, অর্থাৎ প্রতি ১০০০ জনে মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র ১ জন। আর, এবারকার ইবোলা মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আক্রান্তের ৬০ শতাংশ। ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ পদ্ধতি যেরকম, তাতে কিন্তু এটির পক্ষে খুব বড় মহামারী তৈরি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ইবোলা ভাইরাস মোটেই বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না, ছড়ায় রোগীর দেহনিঃসৃত তরল থেকে, কিম্বা দেহের কোনো কাটা অংশ বা মুখের লালা থেকে। সবচাইতে বড় কথা হল, ইবোলা ভাইরাস-আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে রোগলক্ষণ খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ও তাকে সহজেই চিহ্নিত করে আলাদা করে ফেলা যায়। তাহলে আফ্রিকায় এই ভাইরাস এমন মারণ ভাইরাসে পরিণত হল কীভাবে?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের চোখ ঘোরাতে হবে ওই জায়গাগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে। এটা কোনো দুর্ঘটনা বা সমাপতন নয় যে আফ্রিকার মত গরিব দেশের মানুষরাই বারবার এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন। আর এবার এই ভাইরাসের আক্রমণের ক্ষেত্র হলো তিনটি দেশ— লাইবেরিয়া, গিনি আর সিয়েরা লিওন— ইউনাইটেড নেশনস-এর মানবোন্নয়ন সূচক (Human Development Index, HDI) অনুযায়ী ১৮৭টি দেশের মধ্যে যাদের স্থান যথাক্রমে ১৭৫, ১৭৯ ও ১৮৩-তে। এই দেশগুলোর চিকিৎসাব্যবস্থা মোটেই কার্যকর নয়। 'চিকিৎসাব্যবস্থা' জিনিসটাই কোথাও কোথাও অনুপস্থিত। কাজেই ইবোলা মহামারীর জন্য দায়ী যতটা না ইবোলা ভাইরাস, তার থেকে অনেক বেশি সেখানকার নিদারুণ দারিদ্র্য। ২০১৩ থেকে শুরু করে ২০১৪-র আগস্ট মাস পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪৮, মৃতের সংখ্যা ৩৬৫। মোটামুটি একই সময়ের মধ্যে সিয়েরা লিওনে মেনিনজাইটিসে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৫০, টিবি'তে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৭০, HIV/AIDS-এ মৃত্যুর সংখ্যা ৭৯০, এন্টেরিক ফিভার বা ডায়রিয়াজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৪৫ এবং ম্যালেরিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা ৩০০০। বছরের পর বছর ধরে এখানকার মানুষ এইসব রোগে মৃত্যুবরণ করে চলেছেন, তাবৎ বিশ্বের কারোরই কোনো নজর নেই সেদিকে, কোনোদিন ছিলও না। এই তিনটি দেশে এইসব রোগের চিকিৎসা আজও প্রবলভাবে অপ্রতুল। এর কারণ অবশ্যই বাজারের নির্দেশ। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর মুনাফার সম্ভাবনা এইসব দেশে একেবারেই নেই। তাই এখানকার গরিবগুর্বো মানুষগুলোর জন্য মাথাব্যথাও নেই ওষুধ কর্পোরেশনগুলোর। চিকিৎসা-ওষুধ এগুলো সবই যেহেতু এখন একচেটিয়া পুঁজিবাদী বাজারে পণ্যায়িত, এবং পেটেন্টের নামে জীবনদায়ী, সহজলভ্য ও পুরোনো ওষুধগুলোকে যেভাবে একে একে মহার্ঘ করে তোলা হচ্ছে, তাতে উন্নত বিশ্বেরই অনেক মানুষকে বিনা চিকিৎসায় দিন কাটাতে হয়, গরিব দেশগুলির তো কথাই নেই!

লাইবেরিয়া, গিনি, সিয়েরা লিওন— এই দেশগুলোর কয়েক শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসন তাদের এই দরিদ্র অবস্থার জন্য দায়ী। স্বাধীন হওয়ার পরে তারা স্বাভাবিকভাবেই নয়া-ঔপনিবেশিক শাসনের তীব্র যাঁতাকলে পড়ে। বিশ্বব্যাঙ্ক, IMF প্রভৃতি নানা সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা তাদের দেউলিয়া করে দিতে থাকে নানারকম আর্থিক নীতির বোঝা চাপিয়ে। এই সংস্থাগুলোর শর্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী, এই দেশগুলো জনকল্যাণমূলক নানা প্রকল্প ও জনসাধারণের জন্য নানা পরিষেবার খরচ ও ব্যয়-বরাদ্দ কমাতে বাধ্য হয়। এর পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এদের ওপর চাপায় নয়া-উদারনৈতিক বাণিজ্যনীতির বোঝা। ফলে, ঝাঁঝরা হয়ে যেতে থাকে এই দেশগুলোর নিজস্ব অর্থনীতি। তার ওপর ঔপনিবেশিক শাসন-পরবর্তী সময়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শুধু দারিদ্র্য আর অসাম্যই নয়, এই দেশগুলোতে দেখা দেয় ভীষণ দুর্নীতি। যেমন, সিয়েরা লিওনের প্রায় গোটা পাবলিক সেক্টরটাই আর্থিক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। ২০১৩ সালে সেখানে ৭ জন ডাক্তার ও জনপরিষেবায় নিযুক্ত ২২ জনকে GAVI নামক বিল গেট্স ফাউন্ডেশনের 'অনুদান' হিসেবে পাওয়া টাকা নয়ছয় ও তা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলো 'চ্যারিটি'র নামে নানাধরনের সাহায্য পাঠায় এই দেশগুলোতে, কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে আরো বেশি বেশি করে লুঠ চালাতে থাকে, আর ধ্বংস করতে থাকে এদের অর্থনীতিকে। আশ্চর্যের কথা হলো, এইসব গরিব দেশগুলোর মানবসম্পদ উন্নত দেশগুলোর নিজেদের

স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ভর্তুকির কাজে ব্যবহৃত হয়! এখানকার ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের দেশের তুলনায় OECD দেশগুলোতে বেশি পরিমাণে কর্মরত।

কাজেই, এইসব দেশে কোনো কার্যকর জনস্বাস্থ্য-সুরক্ষাব্যবস্থা বা উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠা সম্ভবও না। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা খুব সচেতনভাবেই তা গড়ে উঠতে দেবে না। উল্লেখ্য, ইবোলা-ভাইরাসের একমাত্র কার্যকর ওষুধ (যার নাম দেওয়া হয়েছে ZMAPP) পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করেছে আমেরিকান ও কানাডিয়ান সহযোগিতায় তৈরি হওয়া এমন দুটি কোম্পানি, যাদের আর্থিক পরিকাঠামো WHO, IMF, UNICEF, বিশ্বব্যাঙ্কের দাক্ষিণ্যের ওপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়।

বর্তমানে এই তিনটে দেশে ইবোলা-সংক্রমণ নিয়ে পশ্চিমী মিডিয়া, বিশেষ করে আমেরিকান মিডিয়া খুব 'সচেতন'। তার কারণ হলো, এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নিজেদের প্রয়োজনে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতিসাধনের ফলে ইবোলা-সংক্রমণ প্রসারণের ক্ষেত্র আর আফ্রিকার মাত্র কয়েকটা গরিব দেশেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ তাঁদের মূল থেকে উৎখাত হয়ে অভিবাসী হিসেবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। আর তাই, আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এই ভয়ে কাবু যে, ইবোলা বুঝি তাদের সুখের সংসারেও হানা দেবে। এবং তার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছেও বটে। মার্কিন সেনার অতন্দ্র পাহারা, বা এয়ারপোর্টের অভিবাসন-বিভাগের নিশ্ছিদ্র নজর এড়িয়ে কোনো ইবোলা-আক্রান্ত ব্যক্তি হয়ত ঢুকেও পড়ছেন এদেশে। আর তাই মার্কিন মিডিয়াগুলো একেবারে হইচই ফেলে দিয়েছে। WHO ২০১৪ সালের ইবোলা-সংক্রমণকে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিপদ বলে চিহ্নিত করেছে। তবে মার্কিন মুলুকের সংবাদপত্র-টিভি-ইন্টারনেটের এমনতরো হাহাকারের পেছনে অন্য কারণও আছে এবং সেটা নেহাত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবার সেদিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

ইবোলা ও মার্কিন নাগরিক সমাজ

মার্কিন টিভি-চ্যানেল, পত্রপত্রিকা, নানা সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই ইবোলা নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছে এবং নানা বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন করে চলেছে। তার সাথে মিশেছে সাধারণ মানুষের অসীম কল্পনাশক্তি। ঘটনা হল, এখনো পর্যন্ত আমেরিকার মাটিতে যে একটিমাত্র ইবোলা-ভাইরাসঘটিত মৃত্যুর সন্ধান পাওয়া গেছে, তার নাম টমাস এরিক ডানকান, তিনি লাইবেরীয়, এবং কৃষ্ণাঙ্গ। অন্যান্য মার্কিন শ্বেতাঙ্গদের চিকিৎসা যে হাসপাতালে চলছে, ডানকানের চিকিৎসা সেখানে করতে দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য হল, অন্যান্য রোগীদের যেখানে বলা হচ্ছে 'আক্রান্ত', ডানকানকে সেখানে দেখানো হচ্ছে 'রোগের বাহক' হিসেবে। এমনকি ডানকান যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন এক স্থানীয় উকিল তার বিরুদ্ধে জনসমক্ষে ফৌজদারি মামলা করার হুমকি দেন! ঘটনাটি ডালাস শহরের। এই গোটা বিষয়টার সাথে জুড়ে রয়েছে মার্কিন সাধারণ মানুষের বিদেশিদের প্রতি অবিশ্বাসের একটা সংস্কৃতি। আর, ইবোলার এই বাতাবরণের মধ্যে মার্কিন মিডিয়াও খুব সুচারুভাবে মানুষের মধ্যে থাকা সেই জেনোফোবিয়াকে (Xenophobia) উস্কে দিচ্ছে। এর ফল হচ্ছে মারাত্মক। মার্কিন নাগরিকরা সেদেশে বসবাসকারী অ-মার্কিনদের বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের ইবোলা-বাহক ভাবতে শুরু করেছেন। ফলে খুবই বিপদে পড়েছেন সেখানকার আফ্রিকান ও আফ্রো-আমেরিকান মানুষেরা। অভিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে কোথাও কাজে যাওয়া খুব মুস্কিল হয়ে গেছে তাঁদের পক্ষে। এমনকি ডালাস শহরে আফ্রিকান শিশুদের অনেকে ডাকতে শুরু করেছে 'Ebola-Kids' বলে। ডালাসের একটি কলেজ বিদেশি ছাত্রদের ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কোনো ছোঁয়াচে রোগের বাহক হিসেবেই বিদেশিদের দেখতে অভ্যস্থ আম মার্কিন নাগরিক। কিন্তু এবার এই বিদ্বেষী অবস্থা এমনই চরমে পৌঁছেছে যে, অনেক রক্ষণশীল মার্কিন নাগরিক ইবোলা নামের সাথে এমনকি তাঁদের প্রেসিডেন্ট ওবামা-র নাম মিলিয়ে তাঁকে 'ওবোলা' বলে ডাকতেও শুরু করেছেন! ব্যাপারটা স্পষ্ট। ওবামা কেনীয় বংশোদ্ভূত, আর ইবোলা-র জন্মও আফ্রিকাতেই। কাজেই অনেক রক্ষণশীল সাদা চামড়ার মার্কিন নাগরিকের চোখেই তিনি ভয়ানক সংক্রামক ও ক্ষতিকারক ভাইরাসসদৃশ।

কিন্তু খবরের ভেতরেও খবর থাকে। আর সে খবর কোনো মিডিয়া রিপোর্টে প্রকাশ পায় না; ঠিক যেমনটি ঘটছে আমেরিকায়। আমেরিকায় ছোঁয়াচে রোগ হিসেবে ছড়ানোর ক্ষেত্রে ইবোলা-র নাম অনেক পেছনে, এ বিষয়ে তার কোনো গুরুত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। যে দুটি বিষয় আমেরিকার জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক, তার কোনোটির সাথেই ইবোলা বা বিদেশি কিংবা অভিবাসীদের কোনো সম্পর্ক নেই। তা একেবারে মার্কিন-সমাজজাত। প্রথমটি হলো একধরনের নন-পোলিও এন্টেরোভাইরাস (EV-D68)। এটির সন্ধান প্রথমবার মেলে ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৯৬২ সালে। সাধারণত গরমকালে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়, এটি আক্রমণ করে শ্বসনতন্ত্রকে, এবং তাই বাতাসের মাধ্যমে খুব দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। মূলত, শিশুরাই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। CDC-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এবছরেই আগস্ট থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত আমেরিকার ৪৬টি প্রদেশে প্রায় ৮২৫ জন এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, এবং অন্তত ৭জন এমন মৃত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাঁদের দেহরসের নমুনায় এই ভাইরাসের অস্তিত্ব আছে। মিশিগান শহরে ম্যাডেলিন রেইড নামের এক সদ্যোজাত এই ভাইরাসের আক্রমণে মারা গেছে। এই ভাইরাসের কোনো টীকা নেই, এবং ইবোলা-র চাইতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত মানুষের সংখ্যা

অনেক বেশি; তা সত্ত্বেও মিডিয়াতে এই ভাইরাস সম্পর্কে প্রচার অনেক কম। দ্বিতীয়ত রয়েছে আমেরিকার টীকাকরণ-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

টীকা জিনিসটা মানবজাতির কল্যাণে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অনেক কঠিন ছোঁয়াচে রোগ টীকাকরণ দ্বারা সারানো কিংবা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকাও এর বাইরে নয়। সেখানে টীকাকরণের হার ৯৫ শতাংশের বেশি (CDC, ২০০৪)। যদিও এই টীকা দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের রোগমুক্তির কাজে সাফল্যের সাথে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবু এই টীকাকরণ নিয়ে নানা বিরুদ্ধ মতও আছে, যদিও তাদের মধ্যে অনেক মতই অবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন। ১৯৯৮ সালে অ্যান্ড্রু ওয়েকফিল্ড নামে এক গবেষক ও তাঁর কিছু সতীর্থ বিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল *ল্যানসেট*-এ তাঁদের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়, বহুল প্রচলিত MMR-টীকা (Mumps-Measles-Rubella) শিশুদের অটিজম রোগের জন্য দায়ী। এই গবেষণাপত্র চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গবেষণার যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দিক যথাযথরূপে পর্যালোচনা না করেই এক শ্রেণীর মানুষ একে প্রামাণ্যতা দিয়ে দেন, ও টীকাকরণের বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকেন। যদিও পরবর্তী কালে অনেক বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করে জানিয়ে দেন যে টীকাকরণ ও অটিজম রোগের মধ্যে কোনো আপাত-সম্পর্ক নেই, তবু বিরুদ্ধ মতগুলো থেকেই যায়। পরে অবশ্য জানা গেছে, ওয়েকফিল্ড ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অমন একটা গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলেন, আর তাঁকে মদত দিয়েছিলেন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি। পরবর্তীকালে, যখন এই বিতর্ক থিতিয়ে আসে, তখন তৈরি হয় আরেক বিতর্ক। এই বিতর্ক তৈরি হয় কিছু টীকায় থাইমেরোসাল (Thimerosal) নামে এক যৌগের সন্ধান পাওয়ায়। এই থাইমেরোসালে থাকা ইথাইলমার্কারি (Ethylmercury) একটি পারদ-ঘটিত যৌগ। পারদ এমনিতে খুবই বিষাক্ত। বলা হয়, টীকায় এই যৌগটি থাকায় সেই টীকা গ্রহণ করার ফলে শিশুদের মধ্যে অটিজম দেখা দিচ্ছে। এখন কথা হল, যে কোনো পদার্থই মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তা বিষবৎ আচরণ করতে পারে। এমনকি মাত্রাতিরিক্ত পানীয় জল, খাদ্যলবণ, ভিটামিন-সি প্রভৃতিও ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাজেই কোনো রাসায়নিক কত পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, টীকায় ব্যবহৃত থাইমেরোসালের সাথে অটিজমের সম্পর্কও পরে গবেষণার দ্বারা খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভেতরে সন্দেহ রয়েই যায়। সেই সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে তোলে সাংবাদিক ডেভিড কার্বি-র ২০০৫ সালের একটি বই, 'Evidence of Harm'। তিনি এই বইয়ে কর্পোরেট ডলারের সাথে চিকিৎসাব্যবস্থার নানা অশুভ আঁতাতের কথা বলেন। সেই আঁতাতের কারণে সাধারণ মানুষ অসহায় ও নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁদের শিশুদের টীকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন, এমন কথাও বললেন। কিন্তু তিনি যে দুটো জিনিসের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেন, তা হল বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সেই ফলাফলের কর্পোরেট ও বাজারি ব্যবহার। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণে সাধারণভাবে এই ধারণা তৈরি হয় যে, টীকাকরণ জিনিসটাই আসলে মারাত্মক ক্ষতিকারক। যাই হোক, প্রচারের প্রবল চাপে পড়ে ওই টীকাগুলো থেকে থাইমেরোসাল যৌগটিকে বাদ দেওয়া হয়। এবং দেখা যায়, বাদ দেওয়ার পর অটিজমের প্রকোপ বাড়তে থাকে; কিন্তু টীকাকরণ-বিরোধীরা একে নিজেদের জয় হিসেবে দেখতে শুরু করে, এবং এবিষয়ে তাদের প্রচারও বাড়তে থাকে। ২০১০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন করে হুপিং কাশির (Pertussis, ট্রিপ্‌স অ্যান্টিজেন টীকায় যার প্রতিরোধ সম্ভব) প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, এবং তা বিগত ৫০ বছরের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক আকার ধারণ করে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সেইসব শিশুরাই আক্রান্ত হয়েছে, যাদের বাবা-মা টীকাকরণের বিপক্ষে ছিলেন। ৯১২০ জন আক্রান্তের মধ্যে মারা যায় ১০ জন। সান দিয়েগোতে ৫১০০ জন বাবা-মা তাঁদের শিশুকে টীকা দিতে অস্বীকার করেন, আর তার মধ্যে ৯৮০ জন হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে টেক্সাসের বৃহত্তম Eagle Mountain International চার্চের ২১জন বাসিন্দা হামে (Measles) আক্রান্ত হন। এরাও টীকাকরণের বিপক্ষে ছিলেন। CDC এবং WHO-এর মত অনুযায়ী, হাম আবার ভয়ানক আকারে ফিরে আসতে পারে, যদি না এর টীকাকরণ চালানো হয়। এই টীকা সহজলভ্য ও সস্তাও বটে। বলাই বাহুল্য, ইবোলা-র চাইতে হামের ভয়াবহতা অনেক বেশি। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে আমেরিকায় প্রতি বছরে হাম-আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাটা এক লাফে ৫০ থেকে ৬০০-তে পৌঁছে গেছে। *টাইমস* পত্রিকার সম্পাদক যথার্থই বলেছেন, অভিবাসীদের যতটা বিপদ আমেরিকানদের থেকে, অভিবাসীদের থেকে আমেরিকানদের বিপদ ততটা নয়।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে ইবোলা নিয়ে মার্কিন মিডিয়া যেভাবে ভয় দেখাচ্ছে, যেরকম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে, তা মোটেই সত্যি নয়। ইবোলা-র চাইতে অন্য অনেক ভাইরাল রোগেই সেখানকার মানুষ মারা যেতে পারেন। এমনকি ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও! আফ্রিকার গরিব দেশগুলি ইবোলার আঁতুরঘর ও চারণভূমি হতেই পারে, কিন্তু আমেরিকা মোটেই নয়। ফলে, ইবোলা নিয়ে চিন্তার মূল জায়গাটা হওয়া উচিত আফ্রিকার আক্রান্ত মানুষদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায়, কীভাবে সেখানে আরো বেশি করে চিকিৎসার সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা নিয়ে। কিন্তু সেখানেই বিপত্তি। আর সে কারণেই মার্কিন মিডিয়াগুলো উঠে-পড়ে লেগেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইবোলা-র

কবল থেকে 'বাঁচাতে'। আর সাধারণ মার্কিন নাগরিকেরা কালাতিপাত করছেন এক কল্পিত ভয়ের বাতাবরণে।

এবার দেখা যাক, মিডিয়াগুলোর এহেন আচরণের কারণ কী। আফ্রিকার ওই দেশগুলোর ইবোলা-সংক্রমণ এই পর্যায়ে পৌঁছনোর আসল কারণ লুকিয়ে আছে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন কার্যকলাপে। তারা মুখে ত্রাণ-চিকিৎসা-ডাক্তার পাঠানোর কথা বললেও কাজে কিন্তু তা করছে না। ব্যাপক হারে ইবোলা ভাইরাসের কার্যকর টীকা তৈরি করার কাজও এগোচ্ছে না। কারণ, তা করতে হলে ভালো রকমের পুঁজি বিনিয়োগ লাগবে। কিন্তু সেই পুঁজি থেকে মুনাফা আসার সম্ভাবনা কম বলে তাতে কোনো দেশই তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাছাড়া, ২০০৭ সালের ব্যাপক আর্থিক মন্দার পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নত দেশগুলো কঠোর মিতব্যয়িতার নীতিতে (Austerity Policy) চলার ফলে জনকল্যাণমূলক নানা খাতে সরকার তার ব্যয়বরাদ্ধ কমাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে, মুখে বললেও ইবোলা-র জন্য আফ্রিকায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠাতে নারাজ সবাই।

ফলে যেটা বোঝা যাচ্ছে, আমেরিকার নিজস্ব চিকিৎসাব্যবস্থা ও তার পরিষেবার ভয়ানক জনবিমুখ হালকে চাপা দিতে মার্কিন মিডিয়াগুলো ইবোলা নিয়ে এমন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। এমনিতেই আমেরিকায় সুচিকিৎসা বেশ দামী। সাধারণ মানুষকে অনেক টাকা খরচ করতে হয় ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পেতে গেলে। সেদেশে চিকিৎসাব্যবস্থা অনেক উন্নত হতে পারে, কিন্তু উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা আর জনগণের জন্য সুলভে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান— দুটো এক জিনিস নয়। তার ওপর ২০০৭ সালের আর্থিক মন্দার পর আমেরিকা সহ মন্দায় প্রভাবিত সবকটা দেশই জনপরিষেবামূলক কাজে ব্যয়-বরাদ্দ অনেক কাটছাঁট করে দিয়েছে। ফলে, সেখানকার মানুষজনের ভালো চিকিৎসা-পরিষেবা সুলভে পাবার সম্ভাবনাগুলোও আরো অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। এ নিয়ে মাঝে মাঝেই ক্ষোভ দানা বাঁধে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেগুলো যথাসম্ভব দমনও করে ফেলা হয়। কিন্তু টিভি-ইন্টারনেটের দৌলতে আফ্রিকা থেকে ইবোলা-সংক্রান্ত যেসব টুকরো খবরাখবর আসছে, তাতে আমেরিকার নিজের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সহজলভ্যতার অভাব নিয়ে আবার নতুন করে ক্ষোভ দানা বাঁধতে পারে— এই আশঙ্কায় মার্কিন মিডিয়া দুটো জিনিস করছে— এক, আফ্রিকার আক্রান্ত দেশগুলিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে মার্কিন সামরিক-অসামরিক মদত পাঠানো এবং তা প্রচার করা (এবং একটু বাড়িয়েই প্রচার করা, কারণ সত্যটা তো আর কেউ সরেজমিনে গিয়ে খতিয়ে দেখছে না!), আর ইবোলা নিয়ে মার্কিন জনমানসে একটা আতঙ্কের আবহাওয়া তৈরি করা, যাতে তারা বেশ কয়েকদিন আর সব ভুলে ইবোলা নিয়েই মেতে থাকতে পারে। বলাই বাহুল্য, গোটাটাই রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট এবং আমেরিকার তাবড় মিডিয়া ব্যারনদের অঙ্গুলিহেলনে চালিত।

ইবোলা ও জলবায়ুর পরিবর্তন

যদিও ইবোলা ভাইরাসের এই বৃদ্ধির পেছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সরাসরি যোগাযোগ নিয়ে এখনো স্পষ্ট করে কিছু বলা যায়নি, তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা পরিবেশের আকস্মিক অনিবর্তনীয় (Irreversible) পরিবর্তনের ফলেই এই ভাইরাসের এত বাড়বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। পুঁজিবাদের অধীনে প্রকৃতির সাথে মানুষের আঙ্গিক সম্পর্ককে (Organic Relation) পুরোপুরিভাবে বিনষ্ট করে ফেলা করা হয়। ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া ও নানা অণুজীবনের সাথে মানুষের সমাজের অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া তার ফলে হয়ে পড়ে অস্থায়ী এবং অস্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও সম্ভবত তাই-ই হয়েছে। এটুকু অন্তত বোঝা গেছে যে, পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে বাদুড়দের (Fruit Bats) স্বাভাবিক বসতি (Natural Habitat) বিপন্ন হয়ে পড়ে ও তারা বিপজ্জনকভাবে সীমিত পরিসরে সমাবিষ্ট (Concentrated) হয়ে পড়ে। সেই ২০০৮ সালেই *সায়েন্টিফিক আমেরিকান* পত্রিকা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে যেসব ভয়ানক ভাইরাস অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে ইবোলা খুবই বিপজ্জনকভাবে আঘাত হানতে পারে। তারপর ২০১৩ সালে *রিসার্চ ইনস্টিটিউট* সিয়েরা লিওন সম্পর্কে তাদের একটি রিপোর্টে বলে যে, এখানে আবহাওয়া পরিবর্তনের অস্বাভাবিক প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, যেমন— বছর বছর খরা, তীব্র বায়ুপ্রবাহ, বজ্রপাত, ধস, অতিরিক্ত মাত্রায় তাপপ্রবাহ, বন্যা, বৃষ্টিপাতের বিন্যাসে পরিবর্তন প্রভৃতি। বিষয়টি নজরে আসায় নাওমি ক্লেইন সহ পরিবেশ-কর্মীবৃন্দ আরও একবার পুঁজিবাদের আত্মধ্বংসী দিকটি নিয়ে সরব হন। তারপর সবার আশঙ্কা সত্যি করে ইবোলা ভাইরাস দুর্নিবার গতিতে সেই দেশগুলোতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পরিশেষে

১৯৫০-৬০-এর দশকে জনস্বাস্থ্যের নীতিনির্ধারকরা মনে করেছিলেন যে পুরোনো ছোঁয়াচে রোগগুলো থেকে বোধহয় রেহাই পাওয়া গেছে— সেগুলোকে পুরোপুরি নির্মূল করা গেছে। হার্ভার্ড স্কুলের জনস্বাস্থ্য বিভাগে মহামারীবিদ্যা (Epidemology) পড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, তার জায়গা নিল ক্যানসার আর হৃদরোগ। মহামারীর চিকিৎসা সংক্রান্ত বিদ্যাশিক্ষা প্রায় শিকেয় তুলে রাখা হল। কিন্তু ভুলটা ধরা পড়ল শিগগিরই। ১৯৬১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় দেখা দিল কলেরা মহামারী, সপ্তমবারের জন্য। ১৯৭০ সালে তা পৌঁছে গেল আফ্রিকায় আর ১৯৯০-এর দশকে দক্ষিণ আমেরিকায়। কিছুদিন থমকে থাকার পর ম্যালেরিয়া আবার তীব্রভাবে থাবা বসাতে শুরু করল। ফিরে এলো আতঙ্ক। ১৯৭৬-এ ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে এলো ভয়ানক ধরনের নিউমোনিয়া রোগ

(Legionnaires Disease)। এসবের সাথে সাথেই ফিরতে শুরু করল আরো নানা ধরনের সব হারিয়ে-যাওয়া ছোঁয়াচে রোগ। প্রমাণ হল, মহামারী-সংক্রান্ত 'নতুন' ধারণাবলীর মূলেই গুরুতর কিছু গলদ থেকে গেছে— ছোঁয়াচ রোগ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক দেরি আছে। কিন্তু কেন এমন হল? কেন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এভাবে পর্যুদস্ত হল? ১৯৩০-এর দশকে ঠিক এভাবেই ভাবা হয়েছিল যে, পদার্থবিদ্যায় আর নতুন কিছু আবিষ্কার বা জানার চেষ্টা করা বৃথা, সবই প্রায় জানা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা সবাই জানি যে, সেটা অত্যন্ত ভুল একটা ধারণা ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্ধারণবাদ (Determinism) খাটে না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান (Medical Science) বা প্রকৃতিবিজ্ঞান (Physical Science) বা জীববিজ্ঞানের (Biological Science) ক্ষেত্রেও একই কথা। এই বিষয়টির সম্যক অনুধাবনই ভবিষ্যতের ভুলগুলোকে শোধরাতে সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞান তখনই ভুলটা করে, যখন সে কোনো জিনিসের গবেষণা করার সময় অজ্ঞাতে আমাদের বিশ্বাস করিয়ে বসে যে সে সেটা আসলে আমাদের সম্পূর্ণ জানা হয়ে গেছে। হয়ত কখনো কখনো সেই অনুমান মিলেও যায়; কিন্তু যখন তা হয় না, তখনই আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, বিহুল হয়ে পড়ি। আমরা আমাদের না-জানাগুলোকে, আমাদের জ্ঞান-আহরণের পদ্ধতির অসারতাগুলোকে, তাদের ব্যর্থতাকে, গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে বাস্তবের অমিলকে মেনে নিতে পারি না। যাই হোক, শুধু এটুকু দিয়ে মহামারী ও ছোঁয়াচ-রোগ সংক্রান্ত বিদ্যার আপেক্ষিক ভুলটা ধরা যাবে না। কেমনভাবে ও কেন একটা সময়ে ভাবা হয়েছিল যে এ বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান আহরিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে না। তার জন্য একটু দেখে নেওয়া যাক, সে সময়ে ঠিক কী কী যুক্তিকাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল :

১) অনেক দিন ধরে নানা ধরনের ছোঁয়াচে রোগে মানুষের মৃত্যু হয়ে এসেছে। সেইসব রোগের লক্ষণ আর বিভিন্ন রোগীর মৃত্যুর কারণগুলো লিপিবদ্ধও করা হয়েছে। গত ১৫০ বছর ধরে সেইসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যাকে যথেষ্ট কমিয়ে আনা গেছে। গুটিবসন্ত প্রায় উধাও হয়েছে, যক্ষ্মা অনেক কমে গেছে, গোটা ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে ম্যালেরিয়াকে তাড়ানো সম্ভব হয়েছে, পোলিও একটি বিরল রোগে পরিণত হয়েছে, ডিপথিরিয়া আর হুপিং কাশিকেও আটকে দেওয়া গেছে, মহিলারা প্রসবের ওপর টিটেনাস-সংক্রমণে আর মারা যান না। ফলে মনে হয়েছিল, আস্তে আস্তে অন্য ছোঁয়াচে রোগগুলোও পাততাড়ি গোটাবে।

২) রোগের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধে' আমাদের হাতে অনেক বেশি 'অস্ত্রশস্ত্র' মজুত আছে। আমাদের ল্যাবোরেটরিগুলো আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। নানা ওষুধ, নানা ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, টীকা প্রভৃতি আছে আমাদের হাতে। প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। ফলে, আমরা জিতছি। জীবাণুদের কাছে বাঁচার একটাই উপায়— মিউটেশনের মাধ্যমে সাড়া দেওয়া।

৩) গোটা পৃথিবী উন্নতি করছে। ধীরে ধীরে সব দেশের হাতেই আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার সব প্রযুক্তি ও ওষুধপত্র চলে আসবে, ও তারাও আধুনিকভাবে সব রোগের মোকাবিলা করতে পারবে।

বলাই বাহুল্য, ওপরের তিনটে যুক্তিই ভুল। প্রথমত, এখানে ১৫০ বছরের ইতিহাসের একটা কথা বলা আছে, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার যে প্রক্রিয়া, তার বোঝাপড়ার মূলেই গলদটা থেকে গেছে। যেমন, ইউরোপে প্রথম প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কথা জানা যায় সেই জাস্টিনিয়ানের সময়ে, অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে, প্রায় দুহাজার বছর আগে। দ্বিতীয়বার প্লেগের কথা জানা যায় ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংকটের যুগে, মানে চতুর্দশ শতকে। তারপর ইতালিতে প্লেগের কথা জানা যায় সপ্তদশ শতকের শুরুতে। এর মূল কারণ ছিল সে সময়কার দুর্ভিক্ষ, আর ব্যাপক এলাকা জুড়ে সেনাবাহিনীর চলাফেলা, কারণ সেটা ছিল যুদ্ধের সময়। আর সবচেয়ে বড় মহামারীর সন্ধান আমরা পাই আমেরিকায় ইউরোপীয় আগ্রাসনের সময়। নানা ছোঁয়াচে রোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্ষুধা আর লুণ্ঠন সেসময় আমেরিকার আদি অধিবাসীদের জনসংখ্যা ৯০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছিল। সমাজের প্রধান-অপ্রধান নানা পরিবর্তন, জনসংখ্যার প্রভাব, ভূমির ব্যবহার, আবহাওয়া-পরিবর্তন, সমাজের পৌষ্টিক অবস্থা, নানা মানবগোষ্ঠীর ছোটবড় নানা প্রব্রজন (Migration) জন্ম দেয় রোগের নতুনতর বিন্যাস ও বিস্তৃতি। সৃষ্টি করে জনস্বাস্থ্যের একেকটা নতুন অধ্যায়। যেমন, ব্যাপক পরিমাণে অরণ্যনিধন মশা-বাহিত, এঁটুলি-বাহিত বা ইঁদুর কিংবা কাঠবেড়ালি-বাহিত রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, কারণ এই প্রাণীগুলো তখন বাস্তুহারা হয়ে পড়ে ও মানুষের সমাজের কাছাকাছি চলে আসে। বিরাট বিরাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, আর তাদের জন্য বড় বড় বাঁধ, জলাধার আর খাল জন্ম দেয় একধরনের পরজীবী প্রাণীর, কাজ করে মশার আঁতুরঘর হিসেবে। একইভাবে চাষের ক্ষেত থেকে পেঁচা, সাপ বা চিতাবাঘ উধাও হয়ে গেলে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য বাড়ে, আর তার সাথে বাড়ে ইঁদুর-বাহিত রোগের সম্ভাবনাও। আধুনিক হোটেলগুলোর বিশেষ ধরনের জল (Chlorinated Water) আর উষ্ণ পরিবেশ (ইউরোপ আমেরিকায়) সাহায্য করে এক ধরনের নিউমোনিয়ার ব্যাক্টেরিয়ার (Legionnaire's Bacteria) প্রজননে। এমনকি স্নানের আধুনিক ব্যবস্থা শাওয়ারের জলের স্প্রে-র সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে বাসা বাঁধে একধরনের ব্যাক্টেরিয়া, যা আমাদের ফুসফুসের একেবারে অন্তঃস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে!

দ্বিতীয়ত, জনস্বাস্থ্যের ধারণাটার মধ্যে একটা সংকীর্ণ

দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। জনস্বাস্থ্য শুধু নজর দেয় জনসমষ্টির দিকে, মানুষের সমাজের দিকে। কিন্তু সে তার ছাত্রদের সাথে পশুচিকিৎসক (Veterinarian) বা উদ্ভিদরোগ বিশেষজ্ঞদের (Plant Pathologist) পরিচয় করিয়ে দেয় না। ফলে, মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজগতে যে নানা ধরনের নতুনতর সব রোগ আবির্ভূত হচ্ছে, তার হদিসই রাখা হয় না। ফলে, জনস্বাস্থ্যের গোড়াতেই জীবজগতের সাথে মানুষের সমাজের যোগসূত্রটা কেটে দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, জনস্বাস্থ্যের মূল তাত্ত্বিক কাঠামোতেও রয়েছে সংকীর্ণতা। এই তত্ত্ব বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক আদানপ্রদান, বিবর্তন (Evolution), জীবজগতের নানা জীবের হরেক অভ্যাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদির সাথে পরিবেশের আন্তর্সম্পর্ককে (Ecology) গুরুত্ব দেয় না। এই তত্ত্ব এটা অনুধাবন করতে অক্ষম যে, প্রাণের উদ্ভব আর তার বিকাশের সাথে পরজীবিতার (Parasitism) একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। পরজীবীরা কখনই মুক্ত অবস্থায় জীবনধারণে সুবিধা করতে পারে না। অন্য কোনো জীবের শরীরে থাকাটাই তাদের বিকাশ ও বিবর্তনের অন্যতম শর্ত। কীভাবে সেই পোষক (Host) দেহ থেকে খাদ্য-আহরণ করা যায়, কীভাবে তাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার (Defense Mechanism) চোখরাঙানি থেকে লুকিয়ে থাকা যায়, এবং কীভাবে প্রয়োজন ফুরোলে সেই দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য পোষক-দেহে যাওয়া যায়, তা নিয়েই তাদের গোটা জীবনচক্র আবর্তিত হয়। ফলে তাদের বিবর্তনও দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, দেহের বাইরের পরিবেশ, এক দেহ থেকে আরেক দেহে যাবার (Transmission) প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি আমাদের রোগ-প্রতিরোধের নানা নতুন নতুন উপায়ের (ওষুধ ইত্যাদি) ওপর নির্ভর করে। আর তাই, বিরাট জনসমষ্টি বা বিস্তীর্ণ ক্ষেতের ফসল কিংবা অন্য প্রাণী—এ সবই তাদের কাছে নতুন নতুন সুযোগ— বংশবিস্তার করার, বেঁচে থাকার। সমস্যাটা এই যে, আমাদের রোগ প্রতিরোধের নানাবিধ উপায় তাদের ওপর ঠিক কী প্রভাব ফেলছে, তারা আমাদের উদ্ভাবিত নানা প্রক্রিয়ার মোকাবিলায় ঠিক কীভাবে সাড়া দিচ্ছে (Response), তা জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণায় তেমনভাবে আসে না। যদিও ওষুধের প্রতি জীবাণুদের প্রতিরোধের (Drug Resistance) বিষয়টি সেই ১৯৪০-এর দশক থেকেই জানা আছে, কিন্তু বারে বারে সেই ট্যাবলেট-ক্যাপসুলকেই এদের বিরুদ্ধে প্রায় একমাত্র 'যুদ্ধাস্ত্র' হিসেবে দেখার প্রবণতা ও এদের 'আক্রমণের' বিরুদ্ধে কার্যকর 'প্রতিরোধ-ব্যবস্থা' গড়ে তুলতে গিয়ে এই কথাটাই বেমালুম ভুলে যাওয়া হয় যে, প্রকৃতিও আসলে আমাদের মতই অত্যন্ত সক্রিয়, ও আমাদের ব্যবহৃত প্রতিটা চিকিৎসাপদ্ধতিতে তার সাড়া দেবার নিজস্ব একটা ক্রিয়াকৌশল, একটা বিন্যাস (Response Pattern) রয়েছে।

শেষত, প্রতিটি দেশ একসময় আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা ব্যবহারে খুব পারদর্শী হয়ে উঠবে— একথাটা নিতান্তই দিবাস্বপ্ন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অধীনে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আর গরিব দেশগুলোর সাথে ধনী দেশগুলোর বাড়তে থাকা অসাম্য কোনোভাবেই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে সবার জন্য সহজলভ্য করে তুলবে না, কারণ এই চিকিৎসাব্যবস্থা এখন মুনাফার বাজারে অত্যন্ত চড়া দামে বিকোয়।

আসলে দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতি সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোর বাস্তব অবস্থার সাথে রোগসৃষ্টিকারী নানা অণুজীব নিয়ে গবেষকদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই যেকোনো রোগের প্রাদুর্ভাবকেই দেখা হয় মানবসমাজে সেই রোগের জীবাণুর 'আক্রমণ' হিসেবে। যেমন ধরা যাক, কলেরা। কলেরার ব্যাক্টেরিয়া যখন মানুষকে আক্রান্ত করে, তখনই তা নিয়ে নানা ভাবনাচিন্তা, গবেষণা শুরু হয়। কিন্তু যখন কলেরার জীবাণু মানুষের সমাজে থাকে না, তখন কোথায় থাকে তারা, সে নিয়ে কখনো ভাবা বা আলোচনা করা হয় না। তাদের স্বাভাবিক বসতি হল সমুদ্রতীরবর্তী প্ল্যাঙ্কটনে। সমুদ্রের উষ্ণতা সামান্য বাড়লে কিংবা নানা বর্জ্যপদার্থ সমুদ্রে মিশে জলের রাসায়নিক শৈলি (Chemical Composition) পরিবর্তিত হলে সেই প্ল্যাঙ্কটনের জীবনধারণেও পরিবর্তন আসে। তাদের অনিয়ন্ত্রিত বংশবিস্তার হয়। ফলে সমুদ্রের মাছেরা তাদের পর্যাপ্ত খাবার পেয়ে যায়, আর মানুষ যখন সেই মাছ খায়, স্বাভাবিকভাবেই কলেরার জীবাণু তার নতুন পোষক-দেহে প্রবেশ করে। তাহলে মানুষের সমাজে কলেরার প্রাদুর্ভাবের জন্যে শুধু ভিব্রিও কলেরি (কলেরার জীবাণু) কে দায়ী করা যায় কি?

জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক যেসব বিজ্ঞানীরা একসময় ১৫০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ভেবেছিলেন যে নানা ছোঁয়াচে রোগের গতিপ্রকৃতি ও মহামারীর বিজ্ঞানকে বুঝে ফেলা গেছে, তাঁরা এটা ভালোভাবেই জানতেন যে, ইতিহাস মোটেই ১৫০ বছর আগে শুরু হয়নি। কিন্তু তার আগের ইতিহাস তাঁদের ওপর কোনো রেখাপাত করেনি। পুঁজিবাদের দুর্নিবার গতি তার আগের ইতিহাসকে একরকম অস্বীকার করতে শিখিয়েছিল। তাই তারা মুখ ফিরিয়েছিলেন বাস্তুবিদ্যা (Ecology), বিবর্তন (Evolution) প্রভৃতি থেকে। আমেরিকায় স্বাস্থ্যদপ্তরের সাথে কৃষিদপ্তরের কোনো যোগাযোগ নেই। সেখানে কৃষি-বিষয়ক স্কুল-কলেজগুলো মূলত গ্রামের দিকে এবং তারা সরকারপোষিত, ফলে ভর্তুকিপ্রদত্ত। তাতে পড়তে যায় সাধারণত কৃষিপ্রধান পরিবারেরই ছেলেমেয়েরা। অন্যদিকে মেডিক্যাল স্কুল-কলেজগুলো সব শহরের দিকে, তারা বেসরকারি, এবং তাতে বিপুল পরিমাণে টাকা দিয়ে পড়তে আসে উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সব ছেলেমেয়েরা, এমনকি বিদেশিরাও। এই দুই গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকে না। কোনো সাধারণ পত্রিকা (Common Journal) নেই এই দুই বিষয়কে

একত্রিত করার লক্ষ্যে, কিংবা এদের মধ্যে আদানপ্রদান তৈরি করার লক্ষ্যে। দুটি বিষয়ই পড়ানো হয় অত্যন্ত প্রয়োগমুখী ভঙ্গিতে (Pragmatist), যার মূল লক্ষ্য থাকে মানবসমাজের নানা চাহিদাপূরণ।

সবশেষে যেটা বলার, সংকীর্ণতা আর প্রয়োগবাদ— উভয়েই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রাধান্যকারী দুই ভাবনা। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ধ্বজা উর্ধ্বে তুলে ধরে সবকিছুকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়। এইভাবে দেখার ফলে জন্ম নেয় নিয়তিবাদী দৃষ্ঠিভঙ্গি, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। পুঁজিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, সেইসব ধ্যানধারণাগুলোই সমাজে প্রাধান্যকারী জায়গায় চলে আসে যারা পুঁজিবাদী নানা সামাজিক সংগঠন দ্বারা পুষ্ট হয়, জ্ঞানের বাজারে যাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব থাকে এবং সর্বোপরি যারা মূল্য তথা মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে। এবং, এই প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে রোগ-ব্যাধি-মহামারী প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের বা উপেক্ষার কিছু নির্দিষ্ট বিন্যাস তৈরি হয়েছে— এই ব্যবস্থার ধ্বংস ব্যতিরেকে যার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

1. Engels, F: The Condition of Working Class in England.
2. Lewontin, R; Levins, R: The End of Natural History?
3. Lewontin, R; Levins, R: The Return of Old Diseases and the Appearance of New ones.
4. Lewontin, R; Levins, R: Ten Propositions on Science and Anti-Science.
5. Centers for Disease Control. 2004. MMWR Weekly, November 12. 53(44): 1041-1044
6. Centers for Disease Control and Prevention Advisory Committee on Immunization. 2002. Practice Records of the meeting held on February 20-21,/2002, Atlanta Marriott North Central Hotel.
7. Citizen Cain. 2005. Slouching Toward Truth—Autism and Mercury, November 30
8. Deer, B. 2007. Andrew Wakefield & the MMR scare: part 2.
9. Doja, A., and W. Roberts. 2006. Immunizations and autism: a review of the literature.
10. Friederichs, V., J.C. Cameron, and C. Robertson. 2006. Impact of adverse publicity on MMR vaccine uptake: a population based analysis of vaccine uptake records for one million children, born 1987-2004.
11. Geier, D.A., and M.R. Geier. 2006. An assessment of downward trends in neurodevelopmental disorders in the United States following removal of thimerosal from childhood vaccines.
12. Goldacre B. 2007. Opinions from the medical fringe should come with a health warning. The Guardian, Saturday, February 24.
13. Honda, H., Y. Shimizu, and M. Rutter. 2005. No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study.
14. Hughes, V. 2007. Mercury Rising.
15. Infectious Diseases and Immunization Committee, Canadian Paediatric Society (CPS). 2007. Autistic spectrum disorder: No causal relationship with vaccines. Paediatrics & Child Health 12(5): 393-95
16. Institute of Medicine. 2001. Immunization Safety Review: Measles-Mumps-Rubella Vaccine and Autism. April 23.
17. Institute of Medicine. 2004. Immunization Safety Review: Vaccines and Autism. May 17
18. 2007. Attack on mothers. June 19. The Hufflngton Post.
19. Kirby, David. 2005. Evidence of Harm: Mercury in Vaccines and the Autism Epidemic: A Medical Controversy.
20. Lancet Editors, 2004. Lancet 363(9411).
21. Wakefield, A.J., S.H. Murch, A. Anthony, J. Linnell, D.M. Casson, M. Malik, M. Berelowitz, A.P. Dhillon, M.A. Thomson, P. Harvey, A. Valentine, S.E. Davies, and J.A. Walker-Smith. 1998. lleal-lymphoid-nodular hyperplasia, nonspecific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 351(9103):637-41.
22. Taylor, B., E. Miller, CP. Farrington, M.C. Petropoulos, I. Favot-Mayaud, J. Li, and P.A. Waight. 1999. Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association. Lancet 12; 353(9169):2026-2029.
23. Parker, S.K., B. Schwartz, J. Todd, and L.K.. Pickering. 2004. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data. Pediatrics 114(3):793-804.
24. Mitchell, S., J. Brian, L. Zwaigenbaum, W. Roberts, P. Szatmari, I. Smith, and S. Bryson. 2006. Early language and communication development of infants later diagnosed with autism spectrum disorder.
25. Miles, J.H., and T.N. Takahashi. 2007. Lack of association between Rh status, Rh immune globulin in pregnancy and autism. American Journal of Medical Genetics, Part Al. 143 (13) : 1397-407

ইন্টারনেট সূত্র :

1. http://www.healthline.com/health-news/children-anti-vaccination-movement-leads-to-disease-outbreaks-120312a.
2. https://web.stanford.edu
3. http://www.workers.org/articles/2014/08/09/capitalism-increases-ebola-dangers/
4. http://www.phmovement.org/sites/www.phmovement.org/files/phm ebola_23_09_2014final_0.p df
5. http://www.truthdig.com/report/item/hysteria_overebo I a fue 1 srac i smwh i 1 ethereal d i sease is_capitalism_20141 # 14136823050211 &action=collapsewidget&id-1989223
6. http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/history/chronology.html

মতামত

আফস্পা যদি 'বিবেকী' হয়ে ওঠে :

মানবাধিকার আন্দোলনের সামনে একটি প্রশ্ন

মানবাধিকার সংগঠনগুলো আজ বেশ দুর্বল। যেন এক ধরনের অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে, ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে— এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু এরকম কি হবার কথা ছিল? সাধারণভাবে বলা যায়, পরিস্থিতি তাদের আরো বেশি প্রাণবন্ত, সমর্থ ও গতিশীল ভূমিকা দাবি করছে। কারণ দেশে রাষ্ট্রের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কোনো ছেদ নেই; কমতি নেই বরং তা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় মানবাধিকার সংগঠনগুলির কি আরো বেশি করে সক্রিয় হয় ওঠার কথা ছিল না? অথচ তারা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। এই বৈপরীত্যের কারণ কী?

একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের দ্বারা নিপীড়ন, মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনা ঘটলে এই সংগঠনগুলি পথে নামতো, মানুষের সমর্থন-সহযোগিতা পেত আর অনেক ক্ষেত্রেই জুলুম বন্ধ করতে, ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সফল হতো। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে কালা-কানুনগুলোর বিরুদ্ধে তারা উল্লেখযোগ্য লড়াই গড়ে তুলেছে, বন্দিমুক্তির দাবিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। আদালতের লড়াইয়েও অনেকবার জয়ী হয়েছে তারা, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির ক্ষেত্রে এবং এই বন্দিদের সংজ্ঞা আদালতের রায়ে আদায় করতেও সফল হয়েছে। কিন্তু আজ! কিছু অর্থ-প্রাপ্ত এনজিও ছাড়া বাকিরা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত আজ মানবাধিকার আন্দোলনও প্রায় ফান্ডেড এনজিও-দেরই কুক্ষিগত। তারা আজ বড়ো বড়ো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলে মানবাধিকারের, আন্দোলনের পাঠ দিচ্ছে। তারাই আজ মানবাধিকার আন্দোলনের চ্যাম্পিয়ন। আমরা ব্রাত্য। কেন এই অবস্থা?

দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক পরিবেশটাই ক্ষয়ে যেতে যেতে তা আজ ক্রমশ ধ্বংশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই ক্ষয়ের সঙ্গে পুঁজিবাদ বিশ্বায়নের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই বিশ্বায়নের অন্যতম নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হল ঐ অ-সরকারি সংগঠন এনজিওগুলি। এই অবস্থায় কোনো বুর্জোয়া অধিকারের লড়াইও আজ এগুতে পারছে না, সেগুলোকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অধিকারের আন্দোলনগুলোর মোকাবিলায় সবক্ষেত্রেই যে রাষ্ট্র সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিচ্ছে, তা নয়। আরো নানা উপকরণ এনে হাজির করছে তাকে নস্যাৎ করতে। আর সেগুলোর রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়ে সেসবের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে এই আন্দোলন। কাজেই আজ মানবাধিকার/গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদির আন্দোলন দুর্বল হতে বাধ্য।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির একসময়ে দাবি ছিল মানবাধিকার কমিশন গড়তে হবে, নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চাই ইত্যাদি। আজ এর অনেকগুলোই পাওয়া হয়ে গেছে। সরকার মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন ইত্যাদি গড়ে দিয়েছে, তথ্যের অধিকারের আইন হয়েছে, শিশুদের শিক্ষার জন্য, শিশুশ্রম আর শিশুদের ওপর উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য আইন হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্র ক্রমশ যেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে সে ব্যাপারে নজর রাখছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন ও অন্যান্য সংস্থা! গণতন্ত্র যেন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে চলেছে। এই ধরনের গণতান্ত্রিক ও মানবিক ব্যবস্থাপনার রাজনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করতে পারছে না, এমনকি বোধহয় চাইছেও না দেশের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবিদার অধিকাংশ সংগঠন— মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তো কথাই নেই। কাজেই মানবাধিকার-গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার/আদায়ের জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছে না তারা। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে অভিযোগ জানানো মানুষেরা, আজ যাচ্ছেন মানবাধিকার কমিশনে মহিলা কমিশনে, সংখ্যালঘু কমিশনে, দ্বারস্থ হচ্ছেন তথ্যের অধিকার আইন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন ইত্যাদির। সেগুলোর কার্যকারিতা যত তুচ্ছই হোক, আজকের চরম দক্ষিণপন্থী আবহে মানুষ লড়াই করে দাবি আদায়ের ভরসা খুঁজে না পেয়ে তাদের ওপরই নির্ভর করছেন।

এই চোরাবালিতে আটকে পড়ছে মানবাধিকার সংগঠন-গুলো। তারা প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ হারাচ্ছে। এই আক্রমণে বিশ্বপুঁজির রাজনৈতিক হেডকোয়ার্টার রাষ্ট্রসঙ্ঘ সারথির ভূমিকা নিচ্ছে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মানবাধিকার সনদ গৃহীত হবার পর আরো অনেকগুলো বিষয় তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে কতকগুলো *কভেন্যান্ট* (covenant) গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির 'গণতান্ত্রিক' সাজপোষাক আর বোলচাল হারিয়ে দিচ্ছে মানবাধিকার আন্দোলনকে, তাকে হাইজ্যাক করছে। ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই মানবাধিকারের সনদ রচনা আর রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাকে গ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল কার! জাপানে পরমাণু বোমা ফেলে এসে হাতের রক্ত মুছতে মুছতে ওরা এটা করল। যারা নিজেদের দেশে কমিউনিস্টদের জন্যে কোনো গণতন্ত্রের ধার ধারেনি, ম্যাকার্থি যুগে ডাইনি-খোঁজা করে তাদের হত্যা করেছে, নির্যাতন আর গ্রেপ্তার করেছে হাজারে হাজারে, কৃষ্ণাঙ্গদের ওপরে চালিয়েছে নিপীড়ন, ভিয়েতনামে আর সারা পৃথিবীজুড়ে ব্যাপক হত্যালীলা চালিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে শিখণ্ডী রেখে, পরবর্তীকালে যুগোস্লাভিয়া (যার অস্তিত্বই মুছে ফেলা হয়েছে), আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া যার শিকার হয়েছে, প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলের

সমস্ত অপরাধের নেপথ্যে রয়েছে যারা, তারাই কিনা আজকের পৃথিবীর গণতন্ত্রের পাহারাদার! এই রহস্যের মর্মোদ্ধার না করে কি সত্যিকার গণতন্ত্রের সৈনিক হওয়া সম্ভব? কিন্তু একাজে দেখা যায় প্রবল অনীহা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদকেই মোক্ষ করেছেন অনেকে। তার সীমাবদ্ধতাকে বোঝা আর তাকে ছাপিয়ে যাবার প্রয়াস অত্যন্ত দুর্বল।

একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রাখা যাক আলোচনার সুবিধার জন্যে।

এদেশে মানবাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের এক দাবি হচ্ছে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' (Armed Forces Special Powers Act, AFSPA) তুলে নিতে হবে। আজ রাষ্ট্র যদি সত্যিই তা তুলে নেয় তাহলে আন্দোলনকারীরা কী বলবেন? এটা তো তখন মানতেই হবে যে, রাষ্ট্র তার হিংস্রতা কমাচ্ছে! আজ কিন্তু এটা মনে করার কারণ রয়েছে যে AFSPA (আফস্পা) আর বেশিদিন থাকবে না। অন্তত আজকের আকারে থাকবে না। মণিপুরের শর্মিলা চানুর মুক্তি প্রসঙ্গে লেখা গত ২২ আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় 'গণতন্ত্রের সৈনিক' বলছে :

> এই (Armed Forces Special Powers Act, AFSPA) আইনবলে সেনাবাহিনী জঙ্গি সন্দেহে যে কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার করিতে পারে, গুলি করিয়া হত্যাও করিতে পারে এবং সেজন্য বাহিনিকে কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। জবাবদিহির দায়মুক্ত এমন দমনমূলক বন্দোবস্ত গণতন্ত্রে চলিতে পারে না। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী কেবল মণিপুরেই এই আইন বলবৎ করিয়া জঙ্গি সন্দেহে অন্তত ২০ হাজার ব্যক্তির প্রাণনাশ হইয়াছে। ... বস্তুত, আফস্পা যতিদন না প্রত্যাহৃত হইতেছে, ততদিন উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রের হাতে এই নিধনকাণ্ড ঘটিয়া চলিবার আশঙ্কা থাকিবেই। প্রায় ছয় দশক আগে জারি করা আফস্পা (দ্বারা) অদ্যাবধি কোথাও কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করা যায় নাই। কী কাশ্মীর উপত্যকায়, কী অসম-মণিপুর-নাগাল্যান্ড-ত্রিপুরা-মেঘালয়ে। বরং এই প্রান্তীয় রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রবিরোধী, ভারতবিরোধী মনোভাব আরও শিলীভূত হইয়াছে। জঙ্গি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সামরিক সন্ত্রাস নিরস্ত্র, নিরীহ জনসাধারণকে বিরূপ, এমনকি বিদ্রোহী করিয়াছে। ...সেনাবাহিনীর অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশবাসীরই একাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা কোনও গণতান্ত্রিক নিষ্পত্তি নহে।"

চমৎকার, কিন্তু এতদিন পরে? এত রক্ত ঝরার পর এই গণতান্ত্রিক চৈতন্যোদয়! প্রশ্ন জাগে— এ কি অকারণে?

সামরিক কর্তাদের বারংবার আপত্তিতে ইতিপূর্বে *আফস্পা*-কে কোথাও এতটুকু শিথিল করাও সম্ভব হয়নি (মনোরমা হত্যার পর সারা মণিপুর জুড়ে অভূতপূর্ব প্রতিবাদের ফলে কয়েকটি জেলা থেকে আংশিকভাবে *আফস্পা* তুলে নেওয়া ছাড়া; আর তাতে জঙ্গি কার্যকলাপ আদৌ বৃদ্ধি পায় নি)। এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আইন অমান্য করতে দেখলে "গুলি করতে বা অন্যভাবে বলপ্রয়োগ করতে, যাতে মৃত্যুও ঘটতে পারে", আর ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, "এই আইনে কেউ কিছু করলে তার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার চলবে না।" তাই নির্মম অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, ফসল আর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, বন্দুকের ডগায় গ্রাম খালি করে ট্রাক ভর্তি করে অন্যত্র ভিন্ন পরিবেশে অপরিচিত মানুষদের মাঝে তাদের ছুঁড়ে ফেলাও চলেছে সাধারণ মানুষের অজ্ঞাতে। মণিপুরে ১৫ হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছে এই আইনের কল্যাণে। এমনকি, ১৯৬৬ সালের মার্চে ভারতীয় বিমানবাহিনী আইজলে সাধারণ মানুষের ওপর বোমা ফেলেছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণ ঠেকানোর নামে। কাশ্মীরে খুব কম করে ধরা হিসেব অনুযায়ী ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আর বিভিন্ন নিরপেক্ষ সংস্থা ও মানবাধিকার গোষ্ঠীর হিসেবে সংখ্যাটা ৭০ হাজারের বেশি। আর নিখোঁজ, অত্যাচারিত, আহত এবং গ্রেপ্তারের সংখ্যাটা যে এর অনেকগুণ বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গত বছর জাস্টিস ভার্মা কমিটি সেনাদের দ্বারা মহিলাদের ওপর হিংসা বা যৌন নির্যাতনকে সাধারণ আদালতের বিচারের আওতায় আনবার সুপারিশ করেছিল, সেনাবাহিনী তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাকে কার্যকর হতে দেয়নি।

কিন্তু, বিগত ছয় দশকের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের শাসকশ্রেণী বুঝেছে, ও দিয়ে হবে না। এতে "বরং এই প্রান্তীয় রাজ্যগুলিতে কেন্দ্র বিরোধী, ভারতবিরোধী মনোভাব আরও শিলীভূত হইয়াছে", আরো বেশি হবে। তাই বিগত সরকারের স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে চিদাম্বরমও এই আইনের কিছু পরিবর্তন চেয়েছিলেন। একবার তিনি বলেন, সংশোধনী এনে একে খানিকটা মানবিক করে তুলতেও বাধা দিচ্ছে সামরিক বিভাগ। জীবন রেড্ডি রিপোর্টেও সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু সামরিক বিভাগ যদি কোনো রকম লঘুকরণেও আপত্তি জানায় তাহলে কোনো সিভিল গভর্নমেন্টের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। (*তেহেলকা*, ১৬/০৩/২০১৩) ২০০৫ সালে জীবন রেড্ডি কমিটির রিপোর্টে *আফস্পা*-কে কেবল বাতিলই নয়, কোন্ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে নামানো যেতে পারে তার এক আইনি ব্যবস্থার (legal mechanism) সুপারিশ করা হয়েছিল। তবু সরকার কিছুই করেনি। অতএব, এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন আর সামরিক বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণের গল্পটা আসলে যে কী, তা স্পষ্ট। রেড্ডি কমিটির রিপোর্ট সরকার আট বছর ধরে চেপে রেখেছিল— এমনই সরকারের আন্তরিকতা! এটা প্রথম প্রকাশিত হয় দক্ষিণের এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে। যাইহোক, এদেশের শাসক শ্রেণী বুঝেছে, এবারে চাই অন্য অস্ত্র। আর,

সম্ভবত এখনই হলো *আফস্পা* তুলে নেবার মোক্ষম সময়। কেন?

যদিও মোদী সরকারের ক্ষমতায় আসার ফলে আজ দেশে গণতান্ত্রিক পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে, রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বৃদ্ধির বিপদ বেড়েছে, কিন্তু আজ ঐ আইন তুলে নিলে কেবল মণিপুর নয়, আনন্দের জোয়ারে ভাসবে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত আর কাশ্মীর। ঐ রাজ্যগুলোতে ভারতবিরোধী মনোভাব দুর্বল হবে, তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জনগণ থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হবে। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ইমেজ উজ্জ্বল হবে। মোদী সরকারের পক্ষে জনমত শক্তিশালী হবে। সামনেই কাশ্মীরের নির্বাচন। পাকিস্তানের সঙ্গে বিদেশসচিব পর্যায়ের আলোচনা বাতিল করেছে ভারত সরকার— পাক রাষ্ট্রদূত হুরিয়তের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এই অজুহাতে। গত দু'দশকে এরকম অজুহাত কেউ দেখায়নি, বাজপেয়ীর আমলেও না। সেই ট্রাডিশন ভেঙেছেন মোদী। এখন *আফস্পা* বাতিল করে বা তাকে 'মানবিক' করে তুলে পাকিস্তান, হুরিয়ত আর জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলার আর কাশ্মীরকে অঙ্গীভূত (সঠিক অর্থে) করার চমৎকার সুযোগ সামনে হাজির। অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাকামী রাজ্যগুলোকেও কব্জা করা অনেক সহজ হবে। শান্তি আর সম্প্রীতির সুবাতাস বইবে ঐ রাজ্যগুলিতে। এ সুযোগ হাতছাড়া করার মত নির্বুদ্ধিতা বোধহয় এরা করবে না, যদি না পরিস্থিতির আচমকা কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। সেইসঙ্গে, *আফস্পা* বাতিলে নয়া ভারত সরকারের উজ্জ্বলতর গণতান্ত্রিক ইমেজ বাণিজ্যক্ষেত্রে এক অনুকূল বাতাবরণ তৈরিতে সহায়ক হবে। গোধরা-পরবর্তী মুসলিম-নিধনকান্ডে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই পৃথিবী জুড়ে ধিকৃত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোদীর সঙ্গে সখ্যতা করলেও আজও ইউরোপের কিছু দেশে তিনি ঢুকতে ছাড়পত্র পাচ্ছেন না। আমেরিকার গণতান্ত্রিক মানুষও মোদীর প্রতি তাদের সরকারের এই উদারতাকে ভালো চোখে দেখছেন না। এই অবস্থায় তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলা খুব দরকার। 'উন্নয়ন'-এর স্বার্থেই দরকার। অমিত শাহ-তোগারিয়া প্রমুখদের যথাস্থানে রেখেও, পাকবিরোধী যুদ্ধজিগির আর দেশের মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক জারি রেখেও তা অনেকটাই করা যাবে *আফস্পা* তুলে নিয়ে। এই এতগুলো লক্ষ্যভেদ করা যাবে একটামাত্র চালে। সেটা তারা করবেন না, তা মনে হয় না। সাম্রাজ্যবাদী পরামর্শদাতারা রয়েছেন সেজন্যে।

এই ভাবনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আনন্দবাজারের ঐদিনেরই প্রথম সম্পাদকীয় 'মোদীর আড়াই পা'। পাকিস্তানের সঙ্গে বিদেশসচিব পর্যায়ের আলোচনা বাতিল করাকে যুক্তিসিদ্ধ করে তুলে মোদীকে প্রচুর বাহবা দেওয়া হয়েছে। "...ঐতিহ্য ভাঙিবার নিদর্শন কেবল যোজনা কমিশনের গণ্ডিতে সীমিত থাকিবে কেন? ...ভারতের কঠোর হইবার যুক্তি আছে।" এবং এরপর— "মোদী বলিতেই পারেন, তিনি ক্ষমতায় আসিয়াই সহযোগিতার হাত বাড়াইয়াছিলেন, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া কিঞ্চিৎ বেশিই বাড়াইয়াছিলেন। ...আপাতত কূটনীতির দাবায় তিনি আড়াই পা অগ্রসর হইয়াছেন। ভুল চাল, বলা চলিবে না।..."

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ যেমন মোদীর ইমেজকে আলোকিত করার পক্ষে এক চমৎকার অজুহাত— আসলে যা অচিরে ঘুরে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধে ভারতকে সুবিধাজনক অবস্থায় এনে দেবে, অন্যদিকে সার্কভুক্ত দেশগুলোকে এক ছাতার তলায় এনে এতদঞ্চলে ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে শক্তিশালী করবে— তেমনই স্বাধীনতাকামী কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রামরত জাতিগুলিকে এদেশের শাসকশ্রেণীর কর্তৃত্বে রাখার উপায়কে মসৃণ করতে *আফস্পা* তুলে নিলে মোদি সরকারের গণতান্ত্রিক পরিচয় আরো উজ্জ্বল হবে। তাই আফস্পা তুলে নেবার সম্ভাবনা আপাতত উজ্জ্বল।

আর, সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে সামরিক বিভাগের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে সামরিক বিভাগের সঙ্গে অসামরিক (সিভিল) প্রশাসনের যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব থাকে, তা-ও মিটে যাবে। এ হল 'আপনা আদমি'-দের ব্যাপার। এই সরকারের ওপর প্রধান সেনা-অফিসারদের পূর্ণ আস্থা আছে। প্রাক্তন সেনা অফিসারদের অনেকেই আজ 'দেশপ্রেমিক' বিজেপি-র নেতা, সাংসদ, বিধায়ক। তাছাড়া, ২৬/১১ বোম্বেতে সন্ত্রাসবাদী হামলার সময়ে মহারাষ্ট্রের এটিএস-প্রধান হেমন্ত কারকারে ও অন্য দুজন অফিসারের মৃত্যু রহস্যের যেটুকু উন্মোচন ইতিমধ্যে হয়েছে, তা-ও দেখিয়ে দিয়েছে সঙ্ঘের ঐ বিপুল প্রভাবকে। ফলে, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই *আফস্পা* তুলে নেওয়া সম্ভব বিজেপি সরকারের পক্ষেই। সামরিক বিভাগের বাধা এক্ষেত্রে তেমন ঘটবে না বলেই মনে হয়।

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে, *আফস্পা* সম্ভবত সংশোধিত হতে চলেছে, মানবিক মুখোশ ধারণ করতে চলেছে।

এই ধারণা যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তবুও যে প্রশ্নটা তুলতে চাইছি তা রয়ে যায়। *আফস্পা* যদি সত্যিই 'মানবিক' হয়ে হাজির হয় তাহলে কী হবে? একে কি গণতন্ত্রের সৈনিকেরা স্বাগত জানাবেন? মানবাধিকার কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবির পূরণ হিসেবে দেখবেন? সর্বৈব অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট প্রবণতাসম্পন্ন এক সরকারকে তুলনামূলকভাবে বেশি মানবিক হিসেবে মেনে নেবেন? নাকি *আফস্পা* সম্পর্কে এসব আজগুবি কল্পনা বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবেন? অথবা, এই প্রশ্ন আজকের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে শাসকশ্রেণীদের দেওয়া 'গণতান্ত্রিক' চালগুলোর প্রেক্ষিতে মানবাধিকার-গণতন্ত্রের প্রশ্নে আরো গভীর চর্চায় নিয়ে যাবার তাগিদ সৃষ্টি করবে!

মানবাধিকার আন্দোলনের সামনে এটা আজ এক প্রশ্ন, যাকে এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় উচিত হবে না।

গৌতম

গ্রন্থ সমালোচনা

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা : একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া

সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত

এক

ছোটবেলায় লালগোলা ঘাট স্টেশন থেকে স্টিমারের দোতলায় বসে পদ্মানদী পেরিয়ে গোদাগাড়ি ঘাট পৌঁছানো, অথবা পাটনা মহেন্দ্র ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে পহলেজা ঘাটে যাওয়া— এসবের মধ্যে দিয়ে এক নতুন জগৎকে আবিষ্কার করার বিস্ময় ও আনন্দ কোনোদিনই ভুলবার নয়। সুমিতা দাসের লেখা *কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা— মুছে দেওয়া সভ্যতার ইতিহাস* বইটি পড়ে এমনই একধরনের অভিজ্ঞতার জোরালো স্বাদ পেলাম।

কলকাতা 'পিবিএস' প্রকাশিত বইটিতে তার শিরোনামের ঈষৎ অস্পষ্টতা সত্ত্বেও দুই আমেরিকা মহাদেশের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসগুলোকে একসূত্রে গেঁথেছেন এই বইয়ের লেখক। ভূমিকায় শুক্লা সান্যাল মন্তব্য করেছেন, "বাঙালীর ইতিহাস-চর্চায় এই বইটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।" ইতিহাসে আগ্রহী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একশো শতাংশ একমত। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে আমি শিরোনামের ঈষৎ অস্পষ্টতার কথা বলেছি কেন? কেননা, শিরোনামের দুটি অংশ 'কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা' এবং 'মুছে দেওয়া সভ্যতার ইতিহাস'। প্রশ্ন হচ্ছে, সভ্যতার ইতিহাসকে কারা মুছে দিয়েছে? অবশ্যই কলম্বাসের উত্তরাধিকারীরা। দুই আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সৃষ্টি কলম্বাস বা তার দেশবাসীরা করেননি। কিন্তু এই সভ্যতাগুলির বিলুপ্তিতে তাঁদেরই ভূমিকা ছিল।

ইটালিয়ান মহানাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) ১৪৯২-এর ৩ আগস্ট তাঁর অভিযান শুরু করে ১২ অক্টোবর পশ্চিম গোলার্ধে প্রথম পদার্পণ করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে এই কীর্তির পাঁচশো বছর পূর্ণ হল। কলম্বাস প্রথমে মনে করেছিলেন তিনি এশিয়ায় পৌঁছেছেন। তাঁর এই ভুল ভাঙতে কিছু সময় লাগল। ততদিনে আর একজন ইটালিয়ান মহানাবিক আমেরিগো ভেসপুচি (১৪৫৪-১৫১২) পশ্চিম গোলার্ধের মূল মহাদেশে পদার্পণ করলেন। মূল মহাদেশটি উত্তর-দক্ষিণ দুটি অংশে বিভক্ত। ভেসপুচির নামানুসারে এই জোড়া মহাদেশের নাম হল উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

লেখক পেশায় চিকিৎসক বলেই দুই আমেরিকার হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা-সংস্কৃতিগুলির সুবিপুল ইতিহাস তুলে ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছেন তাঁর পেশাগত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে। একজন পেশাগত ঐতিহাসিকও এই কাজে এতখানি সাফল্য অর্জন করতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চলমান ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সুমিতার বইটির প্রকাশ একদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আমেরিকা শব্দটি এমনভাবে ইউনাইটেড স্টেট্স্ অব আমেরিকা এই রাষ্ট্রনামের সঙ্গে একীকৃত হয়ে গেছে যে তার বিরুদ্ধে পাথুরে প্রমাণ হাজির করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ১৯১৮-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়কে বহুমেরু বিশ্ব (multipolar World), ১৯৪৫-১৯৯২ দ্বিমেরু বিশ্ব (bipolar wrold) এবং ১৯৯২-২০১৪ পর্যন্ত কালকে একমেরু বিশ্ব (unipolar wrold) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আখ্যা যে যথাযথ নয়, কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকার সভ্যতা-সংস্কৃতির নানা রূপের ইতিহাস তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে সুমিতা আমাদের তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সংকট-দীর্ণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমক্ষীয়মান অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কলম্বাস পরবর্তী ইতিহাসে ১৭৭৬ সালে ১৩টি ঐক্যবদ্ধ ব্রিটিশ উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, ১৭৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কার্যকর করা ও তারপরে 'পশ্চিমে চলো' (go to the west) নীতি অনুসরণ, ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার উপর আধিপত্য ঘোষণা, ১৮৬০-এর গৃহযুদ্ধ আর কলম্বাস-পরবর্তী এই সমগ্র সময় জুড়ে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের ক্রীতদাস হিসাবে কিনে এনে বহুমুখী শ্রমে বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত করা ক্রমাগত চলছিল।

দুই

এক কথায়, আফ্রিকায় যখন আদি মানুষের জন্ম হল, সেখানে থেকে থেকে তারা আফ্রিকা-এশিয়া-ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল, দুই আমেরিকা মহাদেশ তার অনেক আগে থেকেই মহাসিন্ধুর ওপারে। সেখানে মানুষের পদার্পণ ও নানা সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তোলার ইতিহাস সুমিতা আমাদের জানিয়েছেন।

দুই আমেরিকার সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার পূর্বে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সুমিতা আমাদের জানিয়েছেন :

- ৩০ কোটি বছরেরও পূর্বে পৃথিবীর একমাত্র স্থলভাগ ছিল প্যানজিয়া;
- ১৫ কোটি বছর পূর্বে প্যানজিয়া ভাঙনের ফলে সৃষ্টি হয় দক্ষিণ আমেরিকা;
- ১০ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকাও আলাদা হয়ে যায় মাঝখানে সৃষ্টি হয় অতলান্তিক মহাসাগর। পরে দুই মহাদেশ জোড়া লাগে;
- ২ লক্ষ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স বা বুদ্ধিমান মানুষের

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা : মুছে দেওয়া সভ্যতার ইতিহাস। সুমিতা দাস। পিপস্‌ল বুক সোসাইটি, কলকাতা। ২০১৪। মূল্য ২০০ টাকা

উদ্ভব হয় আফ্রিকায়।

আফ্রিকা-এশিয়া-ইউরোপ এই সংযুক্ত মহাদেশ ত্রয়ের বুকে সুমেরিয়া, আসিরিয়া, মিশর, পারস্য, চীন, ভারত, মধ্য এশিয়া, গ্রীস, রোম, আরব মিলে একাধিক সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় রেখেছে। পশ্চিম গোলার্ধের নতুন মহাদেশ দুটিতে এগুলির প্রভাব আমরা দেখিনা। সেখানে অন্যতর ভিন্নতর সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল পুরনো এলাকা থেকে মানুষের পদার্পণে :

- ১৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের আগে আদি আমেরিকানরা আমেরিকায় আসে;
- ১২০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দেরও আগে উত্তর আলাস্কা অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিল;
- ১২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে নিউ মেক্সিকোর ক্লোভিস অঞ্চলে প্রাপ্ত সূঁচালো বর্শা;
- ৮০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলের আমেরিকানরা শস্য, স্কোয়াস, বিন ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করতে শিখল;
- ৩০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে নিউ মেক্সিকো ও আরিজোনার উপত্যকা অঞ্চলে আরও উন্নতমানের শস্য উৎপাদন;
- ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ মেক্সিকোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সুবিন্যস্ত গ্রামীণ জীবন গড়ে উঠেছিল;
- ১০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মেক্সিকো, ফিনিক্স, আরিজোনা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা বল খেলার মাঠ, পিরামিড ধরনের কাঠামো ও বেশ উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল;
- ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দে তিন গোষ্ঠীর জোট আজটেক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেছে আদি আমেরিকানরা এশিয়া ছেড়েছে কবে? বহু হিসেব নিকেশের পর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আদি আমেরিকানরা এশিয়া ছেড়েছে ৩৩ থেকে ৪৩ হাজার বছর আগে। প্রথম আসার পর তারা একাধিকবার ও একাধিক পথে আমেরিকায় এসেছে। পণ্ডিতদের অধিকাংশ মনে করেন, এরা এসেছে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে। মূলত মঙ্গোলিয় জাতির মানুষ। বলা চলে, আদি আমেরিকানদের পূর্ব পুরুষ আর বর্তমান চীনা-জাপানীদের পূর্বপুরুষ একই। আধুনিক জেনেটিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফলও সেই কথা বলে। হিমযুগে এশিয়া আর উত্তর আমেরিকা একসাথে জুড়ে যায়। সাইবেরিয়া আর আলাস্কা হয়ে যায় একই স্থলভূমির অংশ। তখনই আদি আমেরিকানরা এসেছিল আমেরিকায়।

তিন

সুমিতা তাঁর বইয়ে উত্তর-দক্ষিণে সুবিস্তৃত দুই মহাদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে পরিচয় রেখেছেন তার বিস্তৃত পরিচয় এখানে তুলে ধরা অসম্ভব। আমরা সেগুলির তালিকামাত্র পেশ করতে পারি যাতে আগ্রহী পাঠক সুমিতার বইটি পড়তে আকৃষ্ট হন।

আমরা সুমিতার বই থেকে পাঁচটি সংস্কৃতি ও বারোটি সভ্যতার তালিকা পেশ করছি :

১) ভেরাক্রুজ সংস্কৃতি, (২) আদেনা সংস্কৃতি, (৩) অরেঞ্জ সংস্কৃতি, (৪) স্টলিং সংস্কৃতি, (৫) ডেপফোর্ড সংস্কৃতি।

১) ওলমেক সভ্যতা, (২) জাপোতেক সভ্যতা, (৩) মিক্সটেক সভ্যতা, (৪) মায়া সভ্যতা, (৫) তিয়োতিহুয়াকান সভ্যতা, (৬) তলতেক সভ্যতা, (৭) নর্তে চিকো সভ্যতা, (৮) চাভিন সভ্যতা, (৯) মোচে সভ্যতা, (১০) ইনকা সভ্যতা, (১১) মিসিসিপি সভ্যতা, (১২) আমাজন সভ্যতা।

সুমিতার বইটির প্রতিটি পংক্তি ধরে আরো মনোযোগের সঙ্গে পড়তে পারলে আরও কয়েকটি সভ্যতা সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যেত। বার্ধক্য হেতু মনোযোগের বিক্ষিপ্ততার কারণে তা না পারার জন্য দুঃখিত। এখানে সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে তার ধারণাটি রাখছি : সংস্কৃতি হলো কোনো নির্দিষ্ট কালপর্বে কোনো জাতি বা জনসমষ্টির অর্জন বা অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা অর্জিত বিদ্যা, বুদ্ধি, সংগীত-শিল্পকলা, রুচি ইত্যাদির পরিচয়। সভ্যতা : সভ্যতা হলো মানব সমাজের সেই স্তর বা অবস্থা যেখানে বৌদ্ধিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা প্রণালীর উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছে বলে বহুজনে গণ্য করে।

কলম্বাসের সময় থেকে আমেরিরা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের কাল পর্যন্ত সময়কে 'রক্ত বাদল ঝরে' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল কারণ এই সময় ছিল পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলির ইতিহাস ও জনগণকে মুছে দেওয়ার কাল। সুমিতা তাঁর বইয়ে এই নিশ্চিহ্নকরণের পূর্বের কাহিনী উদঘাটন করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

চার

'প্রথমে দর্শনধারী তারপরে গুণবিচারী'। আমরা কিন্তু প্রথমেই সুমিতার বইয়ের গুণ বিচার করেছি, সেইজন্য বাকি থাকে বইটির বহিরঙ্গের বিচার।

প্রথমেই প্রশংসা করতে হয় বইটিতে বিশটি ছোট-বড় আয়তক্ষেত্রের মধ্যে শব্দার্থ বোধিকা সংযুক্ত করার জন্য। এর ফলে বইটি অধিকতর সুখপাঠ্য হয়েছে, কেননা কঠিন বা অজানা শব্দের অর্থ জানার জন্য বইটির পাতা উল্টিয়ে পিছনের দিকে খুঁজতে হয় না। এই কৌশলটি অবশ্যই অনুসরণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, বইটির চিত্রসূচি ও অলংকরণ। রঙিন ও সাদাকালো উভয় প্রকার অসংখ্য চিত্র বইটির বক্তব্যের ফলে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। প্রাসাদ, বলকোর্ট, শস্যাগার, বাজার, পিরামিড, ইনকা ব্রিজ, সোনার ভেলা, মৃৎপাত্র, তাম্রলিপি,

এর পর ৩৬ পৃষ্ঠায়

দৃষ্টিকোণ

কোরপান এর হত্যা : মূল্যবোধের চেনা ছক ভেঙ্গে কিছু অচেনা প্রশ্ন

রাতুল

কোরপান শাহ থমকে দিয়েছে আমাকে, আমাদের... খুন অথবা গণপিটুনিতে মৃত্যু মাঝেমাঝেই ঘটে, তবু এনআরএস... কোরপান কোথাও যেন অনেকটা আলাদা, অনেক বেশি ধাক্কা দিয়েছে আমাদের মধ্যবিত্ত মননে...। কারণটাও অবশ্য খুব স্বাভাবিক, এখানে 'সংগঠিত হত্যাকারীরা' আমাদের শ্রেণী তথা বর্গের অন্তর্গত। 'আমি' মুর্শিদাবাদের কোন এক অজ গ্রামের গণপিটুনিতে চিন্তিত কম হই, কারণ 'আমি' 'ওদের' সাথে নিজেকে জুড়তে বা জড়াতে স্বচ্ছন্দ নই হয়ত... আর দ্বিতীয়ত, এখানে হত্যাকারীরা ছাত্র, বিশেষত ডাক্তারি ছাত্র, যাদের থেকে আমাদের 'মানবিকতা মূল্যবোধের' আশা একটু বেশিই।

এহেন নারকীয় গণহত্যার ঘটনার নানা জটিল মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করছেন মনোবিদ ডাক্তারবাবুরা... 'mob psychology', 'shared interest'... সব জটিল ব্যাপার স্যাপার। হয়তো ঠিকও, কিন্তু এটা কোরপান না হয়ে কোনো 'ভদ্র বেশভূষা' সম্পন্ন যুবক হলে কী হত? আমি নিশ্চিত তখন ওই shared interest বা মব psychology এক ভাবে কাজ করত না। এখানেই শ্রেণী বা বর্গ সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে এই সব mob expression-এ... আর শুধু রাষ্ট্র বা পার্টি নয়, তথাকথিত 'জনগণ' ও কখনও-সখনও regimented হয়ে আগ্রাসী অবদমনকারী ক্ষমতার (power) 'mob' হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে, এই ধরনের ক্ষমতার প্রতিটা অবদমনে লুকিয়ে থাকে শ্রেণী, জাতপাত, বর্গ বা লিঙ্গের প্রশ্ন।

এই ঘটনার পরে অনেকেই মূল্যবোধ মানবিকতা এসবের অধঃপতন নিয়ে খুবই চিন্তিত দেখছি। 'মূল্যবোধ' জিনিসটা কোন স্বয়ম্ভু বস্তু নয়, বিহারের গ্রামে নিচু জাতের মেয়েকে সংগঠিত ভাবে ধর্ষণ করাটা এই একবিংশ শতকেও উঁচু জাতের মূল্যবোধে রয়েছে, তার পাল্টা মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে দলিত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। অন্য জাতে বিয়ে করলে অনার কিলিংটা খাপের মূল্যবোধে আছে, যেমন আছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর moral policing; ওগুলোকে আটকাতে গেলে সংগ্রাম লাগে। ঠিক একই ভাবে কোরপানদের অধিকারও কোন স্বয়ম্ভু 'মানবিক মূল্যবোধ' দিয়ে রক্ষিত হবে না, ওর জন্যও সংগ্রামই লাগবে। ভুল হলে রিকশাওয়ালাকে চড় মারা বা 'কাজের মেয়েকে' শাস্তি দেওয়া 'আমাদের' জন্মগত অধিকার, ওটুকু তো করতেই হয় সিস্টেম চালানোর জন্য... আমি আমার সাপ্তাহিক ছুটি নিয়ে খুব চিন্তিত, কিন্তু ড্রাইভার বা কাজের লোকের ছুটির দাবি অস্বাভাবিক ঠেকে আমাদের। সংগ্রাম লাগবে এই মূল্যবোধটার বিরুদ্ধে, তীব্র সংগ্রাম, শুধু (আনন্দ) বাজারীয় সচেতনতা দিয়ে ঘুচবে না এটা।

ঘটনার পড়ে অনেক ফোন ও এসএমএস পেয়েছি। সবাই খুব চিন্তিত, ডাক্তাররা এত 'অমানবিক' কী করে হয়... ২৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠান-সঞ্চালিকা খুব চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলেন, ''এর ফলে ডাক্তারির মতন মহান পেশাটা কলুষিত হল না?'' মহান পেশা ঠিক কাকে বলে বলুন তো? অতীতে এই পেশায় যে দায়বদ্ধতা জড়িয়ে ছিলো, সেটা নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের কারণেই ছিল, সেই সম্পর্ককেই আপনারা 'মহান' বলছেন। আগে একজন ব্যক্তি-ডাক্তার অনেকটাই তার উদ্যম-উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে পেশাটা চালাতে পারতেন। ওষুধ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবেতেই তাঁর নির্ধারক ভূমিকা ছিল অনেকটাই বেশি। আর বাকিটা সরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে। মানুষ নির্ভর ছিল ব্যক্তি-ডাক্তারের উপর, বিনিময়ে অনেকটা সম্মান পেতেন তারা। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যক্তি-ডাক্তারের ক্ষমতা কমেছে বহুগুণে, তাই 'মানবিক মহানুভবতা' আজ এই পেশায় খুব superficial একটা construct, কিছুটা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মতো। ডাক্তারের কাছে গেলে সে যে টেস্ট করতে দেবে, যে ওষুধ লিখবে, যেখানে ভরতি হতে বলবে অপারেশন করাতে বলবে সেইগুলো পুঁজির নিয়মে চলে, চলে Profit maximization-এর লজিকে, সেখানে ব্যক্তি-ডাক্তারের সত্যাগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু খুবই নগণ্য। আর আজকের যুগে অন্য কোন 'পেশা' যখন সত্যাগ্রহে নামেনি তাহলে ডাক্তাররাই বা নামবে কেন একা একা, কোন বিকল্প স্বাস্থ্য আন্দোলন ছাড়া? আপনাদের ভাষায় 'মহানুভবতা' থুড়ি পুরানো সম্পর্কটা রাখার তাগিদটা কোত্থেকে আসবে... সেই কবে দাড়িওয়ালা বুড়ো *Communist Manifesto*-তে লিখেছিল: ''...নগ্ন স্বার্থ ছাড়া নির্মম 'নগদ লেনদেন' ছাড়া এরা মানুষের সঙ্গে মানুষের আর কোন বন্ধন বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের বরফ-জলে এরা ডুবিয়ে মেরেছে ধর্মউন্মাদনার প্রশান্তদিব্য ভাবোচ্ছাস, শৌর্যমণ্ডিত উৎসাহ ও কূপমণ্ডূক ভাবালুতা। ব্যক্তি মূল্যকে এরা রূপান্তরিত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এনে খাড়া করল ঐ একমাত্র, বিবেক বুদ্ধিচালিত নয় এমন স্বাধীনতা— অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহে অবলুণ্ঠিত শোষণের বদলে এ এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, পাশবিক শোষণ। এ যাবৎ সম্মানিত এবং সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে দেখা প্রতিটি বৃত্তির

অলৌকিক মহিমা, বুর্জোয়াশ্রেণী টেনে খুলে ফেলেছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত কবি, বিজ্ঞানী— সকলকে পরিণত করেছে তার পারিশ্রমিক-প্রাপ্ত মজুরি শ্রমিকে।'' বিগত দেড় দশকে আমাদের দেশে ডাক্তারি পেশার দ্রুত রূপবদল দেখলে বুড়োকে কুর্নিশ জানাতেই হয়, কী বলেন? বর্তমান ভারতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিসরের যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে প্রতিদিন, তাতে এই ব্যবস্থায় সমস্ত পেশা শেষ পর্যন্ত নিছক আর্থিক ক্ষমতা সম্পর্কে। যখন professional success-টা corporate capital-এর লজিকে মিলেমিশে যায় তখন কে মহান আর কে শয়তান!

স্বাস্থ্যব্যবস্থাটাকে অবাধ চলাচলের জন্য health-industry-তে পরিণত করবেন আর তাতে থাকা ডাক্তারদের 'মানবিকতা' নামক ডুমুরের ফুল চলে গেল বলে নাকিকান্না কাঁদবেন, এই ভাবের ঘরে চুরি আর কতদিন! যদি ঐ 'মানবিকতা' বাঁচাতে চান তবে রাস্তায় নামুন স্বাস্থ্যক্ষেত্রের corporatization-এর বিরুদ্ধে।

প্রথমে বেশ অবাক লাগছিল। কিছু ছেলে নয় মারছিল, কিন্তু এত বড় হোস্টেল, এত ছাত্র সেখানে, তারা সব কোথায় গেল? মারার পরও কেউ গেল না কোরপানকে দেখতে?? অথবা ঐ ঘটনার পরও হোস্টেলে সবার সব যেন ঠিক চলছে। কী অদ্ভুত নৈঃশব্দ! মনে পড়ছিল নিজের ডাক্তারি শিক্ষার সাড়ে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা। 'শরীর শরীর তোর মন কোথায়'— বইয়ের পাতায়, ক্লিনিকস-এর ক্লাসে হাতড়ে বেড়িয়েছি সেই মন, মানুষ তো এখানে শুধুই শরীর, জটিল anatomy, physiology, pathology-র নির্মাণ। হাজার হাজার মেডিকেল বইয়ের পাতায়, হাজার ঘণ্টা ক্লাসের কতটুকু ব্যয় করি আমরা 'মানুষ' জীবটার সুখদুঃখ নিয়ে, সমাজ-সমস্যা নিয়ে? মানুষ প্রায় একটা মেশিন আমাদের কাছে, দেকার্তে যেমন বলেছিলেন, আর আমরা তার খুঁত মেরামত করি। ওয়ার্ডে গিয়ে প্রতিটা আর্তনাদকে আমরা অগ্রাহ্য করতে, ইগনোর করতে শিখি, কারণ ঐ আর্তনাদ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই সরকারি হাসপাতালে। আমার ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা ওখানে টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক অভিযোজন, কারণ শুধু ওটা দিয়ে মিটবে না কোনো আর্তনাদ, শুধু শুধু আর্তনাদ বাড়বে আমার মনেও। নতুন ইন্টার্নরা যখন জরুরি বিভাগে যায় তখন তাদের ট্রেনিং নিতে হয় 'ব্যাটিং' শেখার। 'ব্যাটিং' মানে আগত রুগীকে ছলে বলে কৌশলে শান্তি বজায় রেখে ভর্তি না নিয়ে বিদায় জানানো। ভর্তির জন্য বেড খালি ৬টা আর ভর্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রুগি আসবে ৬০টা, এরকম ক্ষেত্রে এ ধরনের মানসিকতাই তোমাকে বাঁচাতে পারে। অভিরামপুর গ্রাম থেকে ১০০ টাকা দিয়ে ভ্যানে তারকেশ্বর রুরাল হাসপাতাল, সেখানে থেকে রেফার হয়ে চুঁচুড়া ইমামবাড়া, সেখানেও সামলানো গেল না তাই রেফার মেডিকেল বা এনআরএস বা অন্য অ্যাপেক্স হসপিটাল, অজস্র টাকা ও সময় ব্যয় করে ভর্তি-প্রত্যাশী রোগীর আত্মীয় যখন মেডিকেল কলেজগুলোয় পৌঁছয় তখন তাদের উৎকণ্ঠা ভরা চোখগুলোর সামনে 'Regret no bed vacant' লিখতে 'অমানবিক' হতে হয়েছিল, নিজেকে অভিযোজিত হতে হয়েছিল। আমাদের ডাক্তারি শিক্ষার পাঠক্রম অনেক জ্ঞানের সাথে নিঃশব্দে ঐ ইগনোর করার, অমানবিকতার ট্রেনিংটাও দেয়, আর এটা আবার কনসেন্ট দেয় ভায়োলেন্সকে... তাই বোধহয় কোরপান এনআরএস-এর ছাত্রগুলোর জীবনে আর একটা 'স্বাভাবিক' কেস। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের এই 'স্বাভাবিকত্ব'টাকে ভাঙতে হবে, আর ওটাকে ভাঙতে গেলে লাগবে হাজার পাগলের হাজার কোরপানদের বিস্ফোরণ...

বি: দ্র: ঘটনার পরে একটাও ছাত্র এখনও গ্রেফতার হয় নি, কিন্তু আটক হয়েছে ক্যান্টিনের দুজন কর্মচারী... হোস্টেলের 'ক্ষমতা কাঠামোয়' ওরাই সবচেয়ে নীচে থাকে তো, ঘটনায় হয়ত বা যুক্ত না থাকলেও তাই ওরাই সবচেয়ে সহজ শিকার রাষ্ট্রের, আমাদেরও। Class always matters, তাই না?

কলম্বাস-পূর্ব আমেরিকা : একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া

৩৪ পৃষ্ঠার পর

ব্রোঞ্জপাত্র, স্বর্ণমুকুট, দেবী মূর্তি, অর্ধনারীশ্বর মন্দিরের অলংকরণ, বোনা পোশাক, ইনকা বস্ত্র, বই-এর পাতা, জ্যামিতিক নক্সা—এই সব কিছুর চিত্র সুমিতা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া আছে সামনের পিছনের প্রচ্ছদ, মলাট ওল্টালেই অলংকৃত পাতায় নানা সংস্কৃতির পরিচয়।

তৃতীয়ত, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে যে এরকম একটি বইকে অবশ্যই নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দ্রুত পাঠ্য হিসাবে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বইটির বিপুল তথ্যভাণ্ডার ও ব্যাপক চিত্রসম্পদ সত্ত্বেও দাম অল্প।

চতুর্থত, আদি আমেরিকানদের অবদান কীরকমভাবে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে তা আমাদের কাছে অজানাই থেকে যেত বইটি না পড়লে— ভুট্টা, আলু, লংকা, টমেটো, পেঁপে, কুমড়ো, নানা ধরনের বিন, চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, আনারস, সূর্যমুখী, পেয়ারা, সবেদা, আতা, শাঁকালু, রাঙালু-র মতো অতি পরিচিত খাদ্য থেকে স্কোয়াস, ক্যাপসিকাম, ট্যাপিওকা, অ্যাভোকোডা, অ্যারারাট্স, এবং তামাক, রবার, কোকো (চকোলেট), ভ্যানিলা...।

স্মরণ

আমাদের কমিউন আর হলো না মীনাক্ষী...

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কান্না মুছে হাসি আনতে হয়...।
—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে এক মাসের বেশি হয়ে গেল মীনাক্ষী আমাদের মধ্যে নেই। যদিও এই এক মাস আমাদের মধ্যে মীনাক্ষীর কথা ছাড়া আর কোনও কথা গল্প নেই। হয়তো একেবারে অন্য একটা বিষয়— কী ভাবে ঠিক ঢুকে যাবে আমাদের মধ্যে। জানি ধীরে ধীরে মীনাক্ষী চলে যাবে গভীরে, যেমন সবাই যায়। এরপর মুখটাও এত স্পষ্ট করে ধরা দেবে না। যেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে দ্রোণ, রবি, জিতু, দাদা, শঙ্কু, মা, আরও আরও কত প্রিয় মুখ।

মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৭২ সালে। হুগলির এক গ্রামে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে আছি, শুনলাম একটি মেয়ে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে চায়। খুব আনন্দ হলো— অমনি ভাবতে শুরু করলাম— এই জায়গাটাকে ধরে কাজ করলে আমরাই পারব এটাকে মুক্তাঞ্চল করতে। এলো মেয়েটি। বেশ লম্বা, খুব রোগা, কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল, কালো সুন্দর দুটি চোখ, সরল মিষ্টি হাসি। ভাল লেগে গেল। একসঙ্গে থাকলাম দুদিন, দেখলাম ও-ও আমার মতো স্বপ্ন দেখে। ওকে বললাম, ''তুমি এই গ্রামটায় থাকো, আমি পাশের গ্রামে থাকছি, আমরা এই অঞ্চলটা মুক্ত করব। তোমাকে অন্যান্য গ্রামেও নিয়ে যাব।'' তারপর আমার শেল্টারে চলে গেলাম। কয়েকদিন পর শুনলাম, ও আবার আসবে বলে কয়েকদিনের জন্য শহরে গেছে। শহরের টান প্রবল। আমারও প্রথম প্রথম গ্রামে থাকতে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু দাঁত কামড়ে ছিলাম। নিজেকেই বকলাম— এর মধ্যে ওর কাছে আমার যাওয়া উচিত ছিল। আমার অভিজ্ঞতা ওকে সাহায্য করত। যাই হোক, ও আর গ্রামে আসেনি। শুনেছিলাম শহরের শ্রমিক বস্তিতে কাজ করছে। আর খবর পাইনি।

আবার আমাদের দেখা হলো। না, কোনও গ্রামে বা শহরের বস্তিতে নয়, একেবারে সরকারি অতিথিশালা, প্রেসিডেন্সি কারাগারে। দেখেই হাত নাড়ল। ওরা তিনজন (কল্পনা, রাজশ্রী আর মীনাক্ষী) তখন সেল-এ। আমার স্থান হলো ডিভিশন ওয়ার্ডে (একসময় যারা ডিভিশন নিতেন তারা থাকতেন— আমরা কোনও নকশাল মেয়ে ডিভিশন নিইনি, কিন্তু এতগুলি নকশালকে রাখার কোনও জায়গা না হওয়াতে আমাদের জেলের ঠাঁই ছিল ওই ওয়ার্ডে) বা নকশাল ওয়ার্ডে। কয়েকদিন পর জেল কর্তৃপক্ষ রাজশ্রী আর মীনাক্ষীকে আমাদের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়। তারপর পূর্ব-দেখার সূত্রে শুরু হল আমাদের কথা বলা... যা শেষ হলো গত ১৮ অক্টোবর শনিবার রাতে। রবিবার ১৯ তারিখ ও টয়লেটে বেসিন নিয়ে পড়ে গিয়ে কোমায় চলে যায়— সমাপ্তি ঘটে ২৪ অক্টোবর সন্ধে ৬-১০ মিনিটে।

মীনাক্ষীর জন্ম ১৯৫৪ সালের ১৬ মার্চ নিউ দিল্লিতে। বেলঘরিয়াতেই ওর ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা। তিন ভাই ও এক বোন। দুই দাদা আর ভাই কয়েকবছর আগে মারা গিয়েছে। মা বেলঘরিয়ায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। নাম ইলা সেনগুপ্ত। বাবা অমিতাভ সেন, লেদার টেকনোলজি কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

মীনাক্ষী '৭১ সালে উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করে। ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ার চান্স পায়। বাবার আপত্তিতে পড়তে যাওয়া হয়ে ওঠে না। এটা নিয়ে বেশ একটা কষ্টও ছিল। এখনও মাঝে মাঝেই তা প্রকাশ করত। কলকাতাতেই কলেজে ভর্তি হয়। তখন ওই সময়ের অনেক তরুণ ছেলে-মেয়ের মতো জড়িয়ে পড়ে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে। এরপর আন্দোলনের সব সময়কার কর্মী হয়ে ওঠে ঘরবাড়ি ছেড়ে।

ধরা পড়ে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে। অবশ্য 'জেল ব্রেক'-এর যে কেসে ও ধরা পড়ে তার সঙ্গে ও যুক্তই ছিল না। ও জানত না সেই দিন 'জেল ব্রেক'-এর প্রোগ্রামের কথা। ও গিয়েছিল একজন কমরেডকে ইন্টারভ্যু করতে, ঠিক সেই সময় ঘটে ঘটনাটি। যার সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজশ্রী, সঞ্জয় সেন, বিজন, বাপি, অনিমেষ সহ আরও কয়েকজন। যেহেতু 'পুলিশি খাতায়' ওর নাম ছিল, তাই ঐ সময় ঐ স্পটে মানে দুইয়ে দুইয়ে চার। পুলিশি হেফাজত, টর্চার, পরে জেল হাজত।

জেল, এখন যার গালভরা নাম সংশোধনাগার— সেখানে বিপ্লবী বা অন্যান্য ধারায় অভিযুক্ত বন্দিদের, ওরা, অর্থাৎ রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধিরা, মন পরিবর্তন করতে চায়। আধপেটা খাওয়া, ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝে (হাঁপানি বা নিউমোনিয়ার উৎকৃষ্ট স্থান), একটা কাপড়, একটা কম্বল। ওয়ার্ডার বা জেলের দালালদের দিয়ে মাঝে মাঝেই অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে মন বদলের অথবা হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিপ্লবীরা হাসি-আড্ডা-গল্প-পড়াশুনা-প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বেশ জীবন্ত হয়েই বেঁচে থাকে। যেমন

ছিলাম আমরা। সকালবেলায় বৌমা (শহিদ অজয় ভট্টাচার্য (শান্তিপুর)-র স্ত্রী রুবি, আমরা বৌমা নামেই ডাকতাম)-র কড়া শাসনে যোগাসন শুরু হতো আমাদের পোকাশুদ্ধ (আমরা বলতাম প্রোটিন) মটর খাওয়ার পর। মীনাক্ষীটা ছিল খুব গেঁতো, কিছুতেই উঠতে চাইতো না। বউমার বকাবকিতে উঠত, কিছুক্ষণ করেই থেমে যেত। মোটা বলে হাঁপিয়ে যেত এমনটা নয়, কারণ তখন ও খুব রোগা। বই হাতে পেলে ও আর কিছু চাইত না। মজার এক ভঙ্গি ছিল ওর শোওয়ার, ওই রকমভাবে শুয়ে— দাঁত মাজা নেই স্নান নেই— পড়েই যাচ্ছে। আমরা বলতাম, ওঠ দাঁত মাজ, স্নান কর। ও নির্লিপ্ত। কখনও কখনও বলত, বাঘ কি দাঁত মাজে, মানুষের থেকে বাঘের দাঁত অনেক ভাল আর শক্ত। স্নান করতে বললে বলত, কুয়োর দড়ি বালতির দড়িটা অত তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় কেন, জলে ভেজে বলে। আমিও সেইজন্য রোজ গায়ে মাথায় জল দিই না। ওর এইসব কুযুক্তি দিয়ে আমাদের থামিয়ে দিত। 'জেল একটা বিশ্ববিদ্যালয়'— এ কথা কতটা যে ঠিক তা জেলের রোজকার যাপনে শিখেছি। কীভাবে মানুষের 'শত্রু' মানুষ-এর সঙ্গে আপসহীন লড়াই করতে হয়। জেলের অকথ্য অত্যাচার সাধারণ বন্দিদের ওপর, আর কতটা অসহায় সাধারণ মানুষ— ওখানে না গেলে জানতেও পারতাম না। আবার ভালোবাসা-বন্ধুত্ব কতটা নিবিড় হতে পারে শিখেছি তা-ও। রাজশ্রীর কাছে ইংরেজি (ফাঁকিবাজ, নিজের দোষেই খুব একটা শিখতে পারিনি), বৌমার কাছে নাটক, বুলুর সেবাপরায়ণতা, রীতার দৃঢ় মানসিকতা, বিজুর আত্মপ্রচার-বিমুখতা, মাসিমার মমতা, খুকুর রান্না আর মীনাক্ষীর কাছে বিজ্ঞান। মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এসব ছিল ভিন্ন গ্রহের বিষয়। কী প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাত—আফশোস হতো আগে কেন ওকে পাইনি। তবে এটাও ঠিক যে বয়েসটা শেখার সে বয়েসটাতেই তো ঘরবাড়ি ছেড়েছি। অবশ্য এর ফলে যা শিখেছি তা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিখতে পারিনি!

দুপুরবেলায় লক-আপ-এর পর খাওয়া সেরে পড়াশুনা আঁকা সেলাই এসব করা হত। বিকেল বা সন্ধেয় লক-আপ-এর পর আমরা গান-গল্প-পড়া এমনকী নাটকের রিহার্সালও করতাম। আবার আড্ডা-বদমায়েশিও চলত। আমরা যখন আড্ডা মারছি মীনাক্ষী উপুড় হয়ে পড়ছে না হয় কিছু লিখছে। কত পেছনে লাগতাম। মীনাক্ষী যদি আমাদের মতো বদমায়েশি করত না লিখে তাহলে আমরা 'জেলের ভেতর জেল'-এর মতো ওইরকম অনবদ্য বই পেতাম না। ওর ওই বই জেলের এনসিএল (নন ক্রিমিনাল লুনাটিক) আর সিএল (ক্রিমিনাল লুনাটিক) বন্দিদের দুরবস্থার কথা জনসমক্ষে নিয়ে আসে। এরপর অনেক মনোরোগীকে মুক্ত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং 'রিহ্যাব'-এর ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭৭ সালে মীনাক্ষী জেল থেকে মুক্ত হয়। এরপর সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সত্যেনের উৎসাহেই ও আবার কলেজে ভরতি হয়। যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে ফিজিওলজিতে অনার্স নিয়ে খুব ভাল রেজাল্ট করে বিএসসি, তারপর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে এমএসসি. পাশ করে। বরাবরই ভেবেছি এত ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও কেন কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা করার সুযোগ পেল না। মাঝে মাঝে মীনাক্ষী বলত একথা, পরমুহূর্তেই বলত, তবে ত্রিপুরায় গিয়ে আমি খুশি। ওখানকার মানুষজনের এত ভালোবাসা পেয়েছি যা হয়তো কলকাতায় থাকলে পেতাম না। জানতাম না জন-জাতি জীবনের রোজকার যাপনের কথাও।

মীনাক্ষী আর সত্যেনের জীবনে ১৯৯৫ সালে আসে 'সম্ভব'। সবাই, এমনকী ওরাও ধরে নিয়েছিল ওদের সন্তান হবে না কোনওদিন। সবসময় ড. বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীকে কৃতজ্ঞতা জানাত ওরা। যা ছিল অসম্ভব সেটা সম্ভব হয়েছিল বলেই সত্যেন ওর ছেলের নাম রেখেছিল 'সম্ভব'।

মীনাক্ষী আর সত্যেনের দাম্পত্য জীবন যারা না দেখেছে তারা ভাবতেই পারবে না কী গভীর সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। কোনওদিন কোনও ঝগড়া না করে দুই নারী-পুরুষ একসঙ্গে থাকতে পারে অথচ নিত্য রঙিন হয়ে, ভাবলে অবাক হতে হয়। সত্যেনের আনন্দ দেখেছি মীনাক্ষী যখন উওমেন কমিশনের সেক্রেটারি হয়। কথা দিয়েও রাখতে পারিনি। সেই গেলাম, কিন্তু সেটা মীনাক্ষীর জীবনে এক ভয়ঙ্কর দিন। সত্যেন বেঁচে থাকতে যারা গেছেন তারাই বলেছেন সত্যেনের আতিথেয়তা ছিল দেখার মতো। ও বেঁচে থাকতে আমাদের জন্য একস্ট্রা লেপ-বালিশ করিয়ে রেখেছিল। সত্যেন যখন ক্যানসারে আক্রান্ত মীনাক্ষী কী না করেছে। বম্বের যশলোক হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ডাক্তার আদবানিকে বারবার বলেছে— "ওকে বাঁচিয়ে দিন, শুনেছি আপনি তা পারেন।" ২০০২-এর অক্টোবরে সত্যেন মারা যাওয়ার পর রাজশ্রী আর আমি দেখেছি— প্রচণ্ড ঝড়ে বিধ্বস্ত এক মানুষকে। শুধু বন্ধুদের ছাড়া কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত না। ফোন ধরত না কারও। পড়াশুনা-লেখা সব ছেড়ে যেন অন্য জগতের মানুষ। এত ভয় পেয়েছিলাম, ভাবতাম কবে বেরিয়ে আসবে এই অবস্থা থেকে। খুব অসহায় লাগত নিজেদের। সম্ভবকেও আদর করত না। তারপর অবশেষে সম্ভবকেই আঁকড়ে ধরে আবার উঠে দাঁড়াল। ফিরে এল নিজস্ব জগতে। শুরু হল আবার লেখা। মীনাক্ষীর এখন পর্যন্ত গ্রন্থিত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচ।

জেলের ভেতর জেল (পাগলবাড়ি পর্ব) ধারাবাহিকভাবে *স্পন্দন* পত্রিকায় বেরোবার পর বই আকারে প্রকাশ পায় সত্যেন আর বন্ধু অজয়-এর প্রকাশনা 'স্পন্দন' থেকে। বইটি পুনর্মুদ্রণ

করে 'পিবিএস' (পিপল্‌স বুক সোসাইটি)। *জেলের ভেতর জেল (মেয়াদি নম্বর)* প্রকাশিত হয় 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশনা থেকে। 'স্পন্দন' প্রকাশনা প্রকাশ করে *শতাব্দী শেষের গল্প*। *মীনাক্ষী সেনের ছোট গল্প* প্রকাশিত হয় 'সেতু' প্রকাশনা থেকে ২০০৪ সালে। ২০১৩ সালে ত্রিপুরার আগরতলার 'প্রান্তর' প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশ পায় *একটি কালো টুপি ও ন্যায় বিচার*। সম্ভবত ও বেঁচে থাকাকালীন এটিই ওর প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ। এছাড়া *দেশ, আজকাল, প্রতিক্ষণ* সহ অনেক ছোট বড় পত্র-পত্রিকায় ওর গল্প প্রকাশ পেয়েছে। গত মাসে (অক্টোবর ২০১৪) বাংলাদেশে ঢাকার এক পত্রিকা ওর একটি গল্প প্রকাশ করেছে। আরেকটা বইয়ের কথা অনেকেই জানেন না। ত্রিপুরার জন-জাতি মেয়েদের ওপর শুধু রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী নয়, অরাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীরও নির্যাতন নিয়ে মীনাক্ষী আর জয়ন্ত রায় অনেক তথ্য দিয়ে একটি বই লেখে, যার প্রকাশ করেছে 'ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ'।

ও রিটায়ার করে এ বছর (২০১৪) মার্চ মাসে। আমার সঙ্গে ওর শেষ দেখা ১ সেপ্টেম্বর। কত কথা। বলল, এবার চলে আসছি ত্রিপুরা থেকে, তখন আমরা একসঙ্গে থাকব। ওকে দেখে কীরকম অস্থির লাগছিল। বললাম, 'তোর কি শরীর খারাপ?' ও বলল, তেমন কিছু নয়, শুধু খুব হাঁপিয়ে পড়ছি। এবার এসে ভাল করে ডাক্তার দেখাব, চিন্তা করিস না, আমি মোটা হয়েও তোর থেকে বেশি কাজ করি'। সত্যিই করত। অবসরের পরও কলেজে যেত পড়াতে। লেখার কাজ। 'সাহিত্য একাডেমির নর্থ-ইস্ট সেন্টার অব ওরাল লিটারেচার'-এর ডিরেক্টর। সন্ধে হলেই ওখানে গিয়ে কাজ করত। ওখানকার ককবরক ভাষাতে কবিতার বই এর আগেই সত্যেনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। সে ধারা বজায় রেখে ওই ভাষায় যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের সাহিত্য সভায় নিয়ে আসা, কী না করেছে। ত্রিপুরার অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিকদেরও উৎসাহ দিয়েছে। ওখানকার জন-জাতি মানুষজনের বড় প্রাণের মানুষ তাদের দিদি মীনাক্ষী। উওম্যান কমিশনের সচিব পদে থাকার সময়ও দলমতের কথা না ভেবে স্বাধীনভাবে কাজ করেছে যাতে নির্যাতিত মেয়েরা সুবিচার পায়। প্রভাবশালী মানুষরা মীনাক্ষীকে ভয় পেত, সমীহও করত। উওম্যান কমিশন ছাড়ার পরও জন-জাতি মেয়ে এবং অন্যান্য নির্যাতিত মেয়েদের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করে গেছে অসুস্থ হওয়ার আগের দিনও। ওই মেয়েদের অর্থনৈতিক, আইনি সহায়তা তো দিতই, বাড়িতে শেল্টার পর্যন্ত দিত। ওখানকার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা কতটা সমীহ করত ওকে আমি নিজের চোখে দেখেছি আর দেখেছি ওর প্রতি মানুষের ভালবাসা। ত্রিপুরার মানুষজনও ওর বড় কাছের, বড় প্রিয়। তাই তো ওখান থেকে কলকাতায় চলে আসবে বলেও এলো না। চিরদিনের মতো রয়ে গেল ওদের মাঝে। ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে আমাদেরও যেন একটা সেতুবন্ধন হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়তে বারবারই 'ওস্তাদ' ছিল আমাদের মীনাক্ষী।

যুদ্ধ, শাস্তি থেকে রেহাই ও স্বাধীনতার খোঁজ

২০ পৃষ্ঠার পর

বিস্ফোরণের ঘটনাগুলিতে হিন্দু ধর্মোন্মাদদের জড়িত থাকার সম্ভাবনাকে আমল দিতে তদন্তকারী সংস্থাগুলি কিসে বাধা পেল?

১০। অনুপ্রবেশ হোক বা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, কোন তথ্যই প্রমাণ করেনা যে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি আসন্ন। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত যে তথ্য দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, ২০০৮-এর তুলনায় ২০০৯ এবং ২০১০-এ এইসব ঘটনা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে :

বছর	*অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা*
২০০৮	৩৪২
২০০৯	৪৮৫
২০১০	৪৮৯
২০১১ জুন পর্যন্ত	৫২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ২০১২-১৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৫ সালে ৫৯৭টি 'অনুপ্রবেশের' চেষ্টা হয়েছিল। এটা ২০০১ সালের অর্ধেক! ২০১১ সালে সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছিল ২৪৭।

২০০৮ সালে ৭৭টি নিয়ন্ত্রণ-রেখা বরাবর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল। ২০০৯ সালে সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছিল ২৮টি। ২০১০ সালে আবার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪৪টি। ২০১১ সালে যৎসামান্য বেড়ে হয়েছিল ৪৫টি।

গত তিন বছরে ধৃত এবং হত অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

বছর	*ধৃত অনুপ্রবেশকারী*	*হত অনুপ্রবেশকারী*
২০০৮	৬	৯০
২০০৯	৯	১০১
২০১০	১	১১২
২০১১ (জুন পর্যন্ত)	০	২

তাছাড়া কাঁটাতারের বেড়া, ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ রুখতে ব্যর্থতা, সরকারের পলিসির কোন গভীর ত্রুটি ইঙ্গিত করে। মোট কথা, জম্মু-কাশ্মীরে, বাইরের যে বিপদের কথা বলা হয়, সেটা প্রধান বিষয় নয়। ৩ লক্ষ সামরিক বাহিনীর সৈন্য, ৬৬ ব্যাটেলিয়ন সিআরপিএফ, ১ লক্ষ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, ২৫ হাজার এসপিও, আরও কয়েক ব্যাটেলিয়ন আইটিবিপি, এসএসবি, এনএসজি ইত্যাদির মিলে ৬ লক্ষ সেনা কাশ্মীরের জনগণের শাসনকার্যে নিয়োজিত, বলা বাহুল্য, কাশ্মীরী জনতার মানস নিয়ন্ত্রণই লক্ষ্য। এই পথেই শাসকরা "জনগণের ইচ্ছা ও মনোভাবে পরিবর্তন আনতে চায়"।

সংশোধনী

নভেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ১০০ বছর পর' লেখাটিতে পৃষ্ঠা ৯, কলম ২ লাইন ১-৪এ ছিল : "তাই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রুশ... লিপ্ত হয়।" হবে : "যুদ্ধ চালাকালীন সময়ে জারের রাজত্বের পতনের পর অর্ন্তবর্তীকালীন কেরেনস্কি সরকার ও জার্মানি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েই যায়। নভেম্বরে রুশ বিপ্লব ঘটলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে শান্তি ও সন্ধি চুক্তি করলেও জার্মান সৈন্যবাহিনী পূর্ব ফ্রন্ট বরাবর রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন অব্যাহত রাখে।"

স্মরণ

এক বিবেকী বিচারকের প্রয়াণ

সিদ্ধার্থ গুহরায়

বৈদ্যনাথপুর রামকৃষ্ণ আয়ার (১৯১৫-২০১৪) গত ৪ ডিসেম্বর চিরতরে চলে গেলেন। রেখে গেলেন সততা, মানবিকতা, নিরপেক্ষতা ও দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতির এক মহান উত্তরাধিকার। ১৯১৫ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি কেরালার থালামেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি থালামেরি আদালতে আইনব্যবসা শুরু করেন। সেই সময় থেকেই তিনি দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষকের স্বার্থে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন। দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে তুলে ধরেন।

১৯৫৭ সালে কেরালায় নাম্বুদিরিপাদ সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৬৫ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হবার পর তিনি আবার আইন ব্যবসায় ফিরে আসেন। ১৯৬৮ সালে কেরালা হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৭১-৭৩ এই দুই বছর তিনি আইন কমিশনের সদস্য হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই সাত বছর সময়কালে তিনি ন্যায়বিচারের স্বার্থে তথা সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার স্বার্থে অসামান্য কিছু রায় দেন। বলা হয়, জরুরি অবস্থা পরবর্তী ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার চরিত্রে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনেন ভি আর কৃষ্ণ আয়ার। সমকালীন ভারতে যে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা কথাটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেই কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবি করতে পারেন এই বিচারক। ১৯৮৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আর ভেঙ্কটরামনের বিরুদ্ধে বিরোধীরা তাঁকে প্রার্থী মনোনীত করেন। স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি পরাজিত হন। ১৯৯৯ সালে ভারত সরকার কৃষ্ণ আয়ারকে পদ্মবিভূষণ সম্মান প্রদর্শন করেন।

কৃষ্ণ আয়ার কেবলমাত্র একজন সৎ ও নিরপেক্ষ বিচারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অক্লান্ত মানবাধিকার কর্মী। স্বল্প সময়ের জন্য কেরালার আইনমন্ত্রী হিসেবে, বিচারপতি হিসেবে এবং অবসরগ্রহণের পর এক একনিষ্ঠ মানবাধিকার কর্মী হিসেবে তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন। বিচারক হিসেবে তাঁর দেওয়া কতকগুলি রায় ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় দিকনির্দেশিকা হয়ে আছে। ১৯৭৫ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভা নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে। এই রায়ের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। এই আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণ আয়ার, এলাহাবাদ রায়ের ওপর একটি শর্তসাপেক্ষ স্থগিতাদেশ দেন। রায়ে তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বসতে পারবেন, কথাও বলতে পারবেন, কিন্তু কোনো বিষয়ে ভোটদানের সময় অংশ নিতে পারবেন না। এই রায় ঘোষণার পরের দিনই ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেন।

জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে ভি আর কৃষ্ণ আয়ায়ের আর একটি বক্তব্য বিখ্যাত হয়েছে আছে। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ঘোষণা করেছিল : ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারা অনুযায়ী ‘জীবনের অধিকার’ পর্যন্ত লঙ্ঘিত হতে পারে জরুরি অবস্থার সময়। ১৯৭৬ সালে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে মামলা করেন শিবকান্ত শুক্লা। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্টের চার জন বিচারপতি পি এন ভাগবতী, অজিত নাথ রায়, চন্দ্রচূড় এবং এম এইচ বেগ সরকারি বক্তব্যকে সমর্থন করেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কৃষ্ণ আয়ার। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত মানুষের জীবনের অধিকার কখনই লঙ্ঘিত হতে পারে না। তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারতের প্রাক্তন সলিসিটার জেনারেল হরিশ সালভে লিখেছেন, তিনি সর্বোচ্চ আদালতকে সর্বোচ্চ লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। (*টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া*, ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

সুনীল বাটরা মামলায় তিনি ভারতের জেলখানাগুলির অবস্থার উন্নতি ও সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর দেওয়া বিভিন্ন রায় ভারতীয় ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই বম্বেতে এক বিধ্বংসী দাঙ্গা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ সভ্যতার সীমা লঙ্ঘন করে। এই ঘটনার ওপর দ্য ইন্ডিয়ান পিপল্‌স হিউম্যান রাইট্‌স কমিশন *দ্য পিপল্‌স ভার্ডিক্ট* নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের ভূমিকায় কৃষ্ণ আয়ার লেখেন : প্রশাসন তার প্রথম কর্তব্য করতে, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য মানবাধিকার, মানুষের জীবনের অধিকার, দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

কয়েক মাস আগে ৯৯ বছর বয়সে তিনি *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ‘দ্য বার্বারিটি অফ ডেথ পেনাল্টি’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ভি আর কৃষ্ণ আয়ারের মৃত্যু একটা প্রতিষ্ঠানের অবসান। তার মনুষ্যত্ব ও মানুষের প্রতি ভালবাসার ইতিহাসে তিনি চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন ন্যায়, সাম্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এক আপসহীন যোদ্ধা। দরিদ্র, অনগ্রসর ও দুর্বল মানুষের কণ্ঠ হিসাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ মঞ্চে চিরকাল আসীন থাকবেন তিনি।